চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ

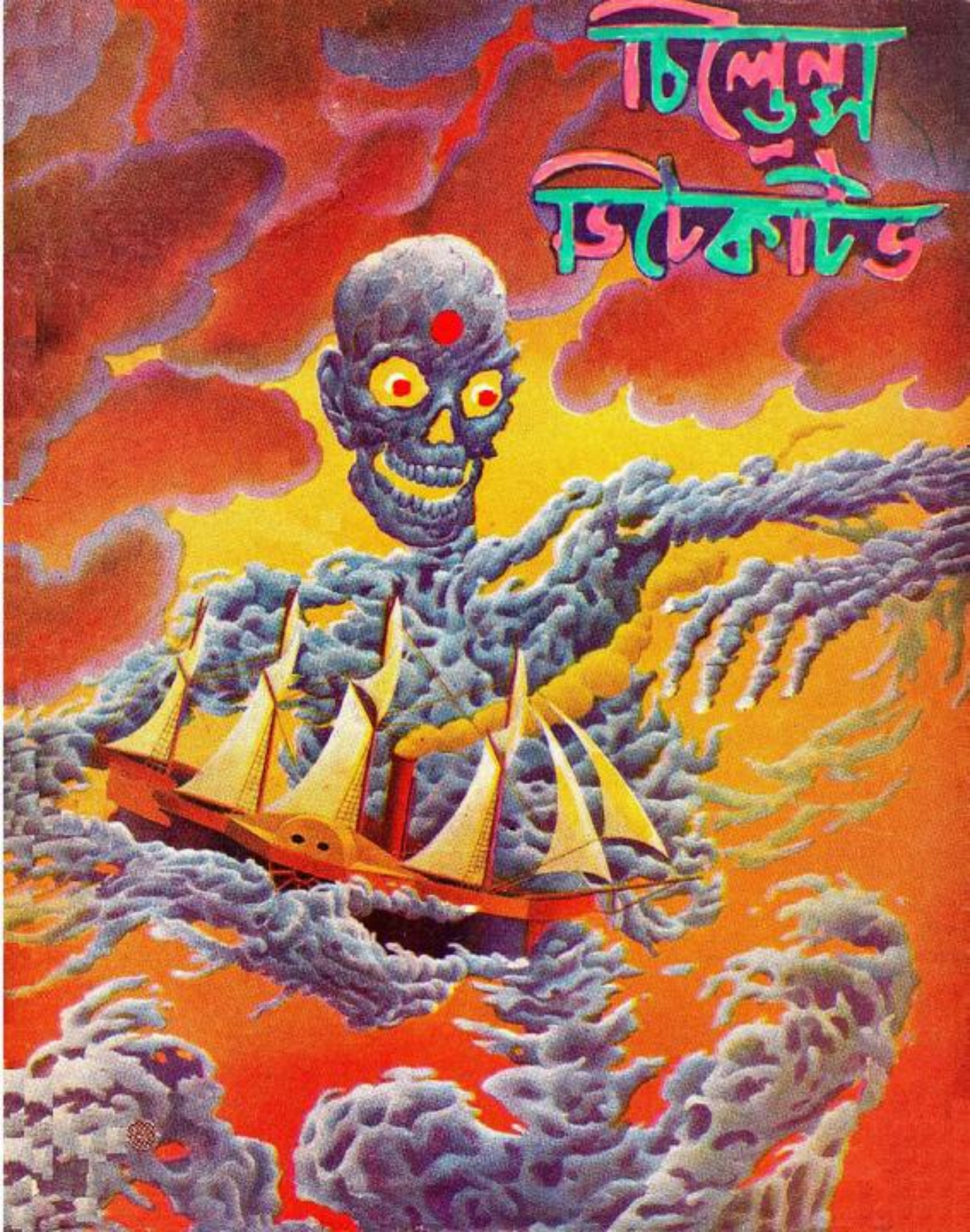

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আড্ডিবালের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

চায়ের কাপ-এ চুমুক দিতে দিতে যখন জানবেন
আমাদের কাছে গচ্ছিত আপনার টাকা পূর্ব ভারতের
চা-বাগিচা ও চা-রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ
জুগিয়ে বিদেশী মুদ্রা অর্জনে ও চা-শিল্পে নিযুক্ত
২৫০০০ শ্রমিকের রুজি-রোজগারে সাহায্য করে
চলেছে। তখন চায়ের স্বাদ আপনার আরও ভালো
লাগবে—নয় কি?
আমাদের কাছে
আপনার জমা টাকা
সুদে দ্রুত বাড়ছে,
ভাবতেও সুখ—
কিন্তু সে টাকা লাগছে,
সুখী-সমৃদ্ধ নতুন পশ্চিমবঙ্গ
গড়ে তুলতে,
এ গৌরবের তুলনা কোথায়!
সেবার মাধ্যমে
ইউনাইটেড
ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজি: অফিস: ৭, রেড ক্রস প্লেস,
কলিকাতা: ৭০০ ০০১
হেড অফিস:
১৭, আর এন মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
চেয়ারম্যান: জে এন বিশ্বাস
Progressive/UIB-2/

চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ

ছোট বন্ধুরা,

ভূত-প্রেত দৈত্য-দানা সত্যিই আছে কিনা, তা নিয়ে মতভেদ আছে ও থাকবে। এসবের কোনও বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না বলেই অনেকে এগুলি অবাস্তব কল্পনা ও কুসংস্কার বলে নস্যাৎ করে দেন। কিন্তু ভূতের গল্প, অলৌকিক কাহিনী পড়তে সকলেরই কমবেশি ভালো লাগে। তাই বর্তমান সংখ্যাটি 'ভৌতিক সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশ করা হ'ল—নানা স্বাদের ভৌতিক—অলৌকিক কাহিনীগুলি নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবে।

চার্লস ডিকেন্সের প্রখ্যাত উপন্যাস 'অলিভার টুইস্ট' এর বেদনা মধুর কাহিনী এই সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস 'বাদশাহী মোহর চলছে, চলবে। এর সঙ্গে আছে 'বিষাক্ত ওষুধ' ধারাবাহিক কমিকস্ আর অন্যান্য নিয়মিত ফিচার। সব মিলিয়ে 'চিলড্রেন্স ডিটেকটিভ'-এর বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। ছবি প্রতিযোগিতায় নাম পাঠিয়েছে?

অমিতাভ সেন

প্রধান সম্পাদক

১৪ই এপ্রিল ১৯৮২।

সোহিনী প্রকাশনী ২৬ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১

দাম—দুই টাকা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত
শিশুপাঠ্য মাসিক পত্র

সূচীপত্র

কিশোরদের একমাত্র গোয়েন্দা মাসিক পত্র

ভৌতিক সংখ্যা

রহস্য উপন্যাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত / বাদশাহী মোহর ১১৭

সত্যি ভূতের গল্প

দুটো পাল্লার ইষৎ ফাঁক দিয়ে একটা শুকনো মমির হাত—

অমিতাভ সেন / মমির রহস্য ১৫১

মিটমিটে আলোতে জন্তুটাকে বড় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ / গোলকপতির অন্তর্ধান রহস্য ১৫৮

অ্যাডগর অ্যালেনপো'র টেল্ টেল হার্টএর সচিত্র কাহিনী

আকাশ সেন / মরেও মরেনা রাম। ১৬১

কৌতুক রহস্য

ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় / অবশেষে কলিঙ্গ সাহেব ১৫৫

চার্লস ডিকেন্স

অলিভার টুইস্ট

ভাষান্তর : ডঃ রবীন্দ্রনাথ বসু ১৩১

৪টি ভূতের গল্প

ডাঃ অভিজিৎ দত্ত / মৃত্যু জাগে রাতের শিয়রে ১৭২

মহীয়সী ব্যানার্জী / ভূত না অতৃপ্ত আত্মা ১২৭

অমিয়ধন মুখোপাধ্যায় / ভৌতিক ১৭৯

অপরীরী / শর্মিলা ঘোষ ১২৩

টারজান কমিকস / ফাঁদ (৩) ৮৩

সোহিনী পাল / জ্ঞানের বহর ১৭৭

কমিকস সিরিজ / বিষাক্ত ওষুধ রহস্য (৫) ১২১

এখন ঘরে বসেই
ফাইভ-ষ্টার
হোটেলের
রান্নার স্বাদ পাবেন।

সুস্বাদু আর মুখরোচক
খাবারের জন্য
আর ফাইভ-ষ্টার
হোটেলে যেতে হবেনা।

হ্যাঁ! "কুক্‌মী" গুঁড়ো মশলা ব্যবহারে আপনি অনায়াসেই ঘরে বসে উপাদেয় অথচ পুষ্টিকর খাবার উপভোগ করতে পারবেন। এমনকি দেশী ও বিদেশী সবরকম বিখ্যাত রান্নার স্বাদ পাবেন আপনার রান্নাঘর থেকেই।

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস্) প্রাঃ লিঃ

কুক্‌মী দিয়েই রাঁধুন!

২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৭০ • ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩৩১২৩২, ৩২৬৬৩২
Cable : 'Cookmepure' • Telex : 021 2591 A/B, 'COOK' • Post Box : Burrabazar 6885, Calcutta-70

iaa 1798

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের একমাত্র
সচিত্র এনসাইক্লোপিডিয়া

বিজ্ঞান কোষ [৫ খণ্ডে]

প্রধান উপদেষ্টা : ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়
(প্রাঃ উপাঃ কলিঃ বিশ্বঃ)

এই কোষগ্রন্থে থাকবে ৩৫টি মূল বিষয়ের উপর বর্ণানুক্রমে পাঁচ হাজারেরও বেশী বৈজ্ঞানিক রচনা, যেখানে পঞ্চাশ হাজারেরও উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান সংক্রান্ত শব্দ / পরিভাষার উল্লেখ থাকবে। প্রতিটি বিষয় লিখবেন স্ব স্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লেখকমণ্ডলী।

পাঁচ খণ্ডের সম্পূর্ণ মূল্য ২৫০ টাকা। গ্রাহক মূল্য ১৫০ টাকা। এককালীন গ্রাহক মূল্য ১২৫ টাকা। ২৫ টাকা দিয়ে গ্রাহক হলে প্রতি খণ্ড সংগ্রহ করার জন্য লাগবে ৩০ টাকা। শেষ খণ্ডের জন্য লাগবে ৫ টাকা।

সম্পাদনা : দেবব্রত মল্লিক, ডঃ সিদ্ধার্থ রায়,
অধ্যাপক সমীর সাহা

ছোটদের নাট্যসম্ভার ২৫্
সম্পাদনা : জ্যোতিভূষণ চাকী ও সমীর চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর পৌরাণিক কাহিনী ২৫্
সম্পা : সমীর রক্ষিত, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, দেবব্রত মল্লিক

কেরিয়ার গাইড : সত্যেন্দ্র আচার্য ২

লক্ষ মাণিক : সম্পা : স্বপনবুড়ো ১৭্

তুরস্কের গল্পগাথা : রবীন্দ্রনাথ দস্তিদার

আরব্য রজনীর গল্প : ভীষ্ম দেব

বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প সম্ভার : সম্পা . সমীর রক্ষিত

ভূতুড়ে গল্প ছড়া : সম্পা : শ্যামলকান্তি দাস

কিশোর জ্ঞানকোষ [দু'খণ্ডে]

মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

আগের কথা : বিপ্লব ও তার মা রত্না দেবীদের পুরোন বাড়ি কিনতে এসে ক্রেতা খুন হল, লাশ উধাও। বিপ্লব বিরূপাক্ষ সেনকে নিয়ে এসেছে। একটা লাশ সনাক্ত করে থানা থেকে ফেরার পথে বিপ্লব ও তার মাকে কিডন্যাপ করা হল। রত্নাদেবী ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরলেন। বিপ্লবকে ওরা বেলগাছিয়া অঞ্চলে একটা বাড়িতে এনেছে। বিষেণ সিং বিপ্লবকে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। বিপ্লবের জুজুৎসুর প্যাঁচে আছাড় খায়। রত্না দেবীর বাড়ির সামনে একজন, বীরেশ্বর রায় এসেছে, বাড়িটা কিনবে। বিরূপাক্ষ এসে পড়েছে। রত্নাদেবী বাড়ি বিক্রি করবেন না। বীরেশ্বর গ্যাস বোমা ছোড়ে। রত্না দেবীকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করে। এক বিশাট গোখরো সাপ দেখে ওরা পালিয়ে যায়।]

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মত চেহারা বিষেণ সিংকে ঘোষাল আর রাখাল কোন মতে টেনে হিঁচড়ে মাটি থেকে তুলে দাঁড় করাবার পরও বিষেণ সিং ঠিক সোজা হয়ে তখনো দাঁড়াতে পারছিল না। অতর্কিতে বিপ্লবের জুজুৎসুর প্যাঁচে আছড়ে পড়ে সে যে বেশ কষ্ট পেয়েছে শরীরের কোথাও, সেটা বুঝতে কারুরই কষ্ট হয় না।

ঘোষাল আর রাখাল তখনো বিষেণ সিংকে দু'পাশ থেকে ধরে রেখেছে।

বিপ্লব থমকে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকের হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে তখনো তাকিয়ে। কিন্তু পিস্তল

দেখে ভয় পাবার ছেলে বিপ্লব নয়। সে এবারে বললে, কিন্তু আমাকে গুলি করেও আপনার লাভ হবে না।

—কি বললে। ভদ্রলোক শুধালেন,

—বলছি আমাকে মেরে ফেললে যে জন্য আমাকে ধরে এনেছেন এই কষ্ট করে সে কাজও হবে না।

—কি কাজ।

—যা আপনি আমার কাছে চান।

—কি চাই জানো তুমি।

—জানবো না কেন। রামধন মিত্তির লেনের আমাদের পুরানো পৈতৃক বাড়িটাইত আপনি চান—

—হ্যাঁ চাই—

—তাইতো বলছিলাম আমাকে মেরে ফেললে সেটা আপনি পাবেন কি করে।

—তাহলে তুমি—

—বলছিলাম কি—

ঐ সময় বিষণ সিং যন্ত্রণায় আবার চেঁচিয়ে উঠলো, মুঝে মার ডালা সরকার। ও শয়তান হ্যায়, ডাকু হ্যায়, উসকো খতম কর দিজিয়ে গোলি মারকে গুড়া দি জিয়ে—

—ঘোষাল—

—সার—

—ওকে নীচের ঘরে রেখে এসো তোমরা—

—নেহি নেহি সরকার। বিষণ সিং আবার কঁকিয়ে উঠলো, বললে নীচুওয়ালা ওহি কামরা মে বহুৎ ইয়া বড়া বড়া চুঁয়ে হ্যায়—হামারা জান লে-লেগা—

ভদ্রলোক সে কথায় কোন কর্ণপাত করলেন না, বললেন ঘোষাল তোমরা ওকে নিচে নিয়ে যাও—

ঘোষাল একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বিষেণ সিংয়ের হাত ধরে বললে, চল।

—নেহি হাম নেহি জায়গা

—আরে চল।

বিপ্লব ফিক্ করে ঐ সময় হেসে ফেলল। তারপর বললে, ওর কসুর কি? ওতো আপনারই হুকুম তামিল করেছিল। ওকে ছেড়ে দিন—ও আর জীবনে আপনার কথায় কান দেবে না।

ভদ্রলোক গর্জে উঠলেন থাম—বেশী পাকামো করো না।

ঘোষাল আর রাখাল তখন টানতে টানতে বিষেণ সিংকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারবে কেন ঐ বিরাট লাশটাকে দু'জনে টেনে নিয়ে যেতে···আর ঐ ভাবে টানা হিচঁড়ায় বিষেণ সিংও বোধ হয় কষ্ট পাচ্ছিল, সে সমানে চেঁচাতে থাকে।

বিপ্লব বললে, আপনি বলেনত আমি ওকে আর একটা প্যাঁচে একে বারে ফ্লাট্ করে দিতে পারি। তখন না হয় ওকে হয় চ্যাং দোলা করে না হয় একটা স্ট্রেচার এনে ওকে এ ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে আপনার ভৃত্যদের কোন কষ্ট হবে না। কি বলেন, দেবো ফ্ল্যাট্ করে—

ভদ্রলোক এবার আরো গর্জন করে উঠে বললেন থামো হে ছোকরা এটা ইয়ার্কি করার জায়গা নয়।

বিপ্লব এবারে হেসে বললে, দোহাই আপনার এবারে দয়া করে আপনার হাতে ধরা খেলার পিস্তলটা নামান।

হোয়াট্। কি বললে, খেলার পিস্তল ওটা!

আজ্ঞে, কারণ ঐ বস্তুটির সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ পূর্ব পরিচয় আছে! আপনি হয়ত ভেবে নিয়েছেন গোড়া থেকেই আপনার হাতের ঐ পিস্তল দেখেই আমি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম ভয় পেয়ে। কিন্তু বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না ব্যাপারটা কিন্তু

তা নয়। গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিলাম এটা একটা Toy মানে খেলার পি য়ল—

বুঝতে পেরেছিলে ?

হ্যাঁ—

এটা যে সত্যি সত্যিই একটা খেলার পিস্তল নয় তার পরীক্ষা চাও।

বেশত ওটা যে সত্যি সত্যিই একটা খেলার পিস্তল নয় সেটা প্রমাণ করেই দিন না একটা গুলি ছুড়ে—

ঐ সময় রাখাল এসে ঘরে ঢুকলো, সার—

কি হোলো।

বিষেণ সিং যন্ত্রণায় ছটফটরাছে—

এক বাটি চুন হলুদ গরম করে লাগিয়ে দাও গিয়ে—

বিপ্লব বললে, এক বাটিতে কি হবে—তাছাড়া বেকায়দা ভাবে পড়ে গিয়েছে। ঐ বিরাট বপু নিয়ে ভরত রামের সেই 'হাড্ডি পিল পিলায় গিয়া'র মত সত্যি সত্যি কিছু হলো কিনা একজন ডাক্তারকে ডেকে—

ভদ্রলোক আবার গর্জন করে উঠলেন, থাম।

বিপ্লব এবারে ঘোষালের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি সার এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন খুব সহজে আমাকে কায়দা করতে পারবেন না—বরং দু'জনে কথা বার্তা বলে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিলে হয় না, বুঝতেইত পারছেন আমাকে ঠেকে রাখতে আপনি পারবেন না—

—হুঁ, তাহলে আমাকে কি করতে হবে শুনি—

—কি করতে হবে আমাকে ছেড়ে দিন—মানে যেতে দিন।

—দিতে পারি—

—তাহলে দিন না,

—দেবো একটা শর্তে

—আমাদের বাড়িটা বিক্রী করবো আমাকে সেটা একটা স্ট্যাম্প কাগজে লিখে দিতে হবে ত—কিন্তু তাতে আপনার লাভটা কি হবে—

সে খোঁজে তোমার প্রয়োজন নেই

আছে কারণ ঐ বাড়িতে কোথায় বাদশাহী মোহর লুকানো আছে সে কথা একমাত্র আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি জানে না।

তু-তুমি জানো।

—জানি, আরো একটা কথা আপনার বোধ হয় জানা দরকার সার।

—কি ! কি কথা শুনি।

—সেই গুপ্তধন সর্বদা সতর্ক পাহারা দিচ্ছে একটা ভয়ংকর গোখরো সাপ, তার একটি ছোবল মানে—

—গোখরো সাপ।

—হ্যাঁ আমার মাও সে কথা জানে না। কিন্তু আমি জানি—

—কি জানো।

—আমি সাপটাকে ২।৩ বার দেখেছি বাড়ির মধ্যে—

—ঠিক আছে সে সাপের ভাবনা তোমার না ভাবলেও চলবে—

—মাঝখান থেকে আপনার টাকা গুলো যাবে

—সে চিন্তা তোমার না করলেও চলবে ছোকরা—

—ভাল কথা বলছি আপনি যদি না শোনেন ত আমার আর কি ? নিয়ে আসুন আপনার কাগজ, সই করে দিচ্ছি

—সই করবে—

—হ্যাঁ আনুন সই করে দিচ্ছি তবে টাকাটা

—হাতে হাতে পাবে

রত্না দেবী চিঠিটা পড়তে লাগলেন।

বিরূপাক্ষ সেন শুনতে লাগল।

—কি—পড়ুন, জোরে চেঁচিয়ে পড়ুন, আমি শুনি।
চিঠিতে ত কারো নাম দেখছি না মিঃ সেন,
—পড়ুন না,
রত্না দেবী সম্মানিতাসু
এই চিঠি হেলা ফেলা করবেন না। আপনার এক মাত্র ছেলে বিপ্লব আমার হাতে বন্দী। তাকে যদি ফিরে পেতে চান ত আপনাদের বসত বাড়িটা আমার কাছে বিক্রী করতে হবে। টাকা যা চান ঐ বাড়ির জন্য পাবেন কিন্তু এই মুহূর্তে না। কারণ আমার হাতে একটি কানাকড়িও নেই বর্তমানে—তবে যে টাকা চান সে টাকার একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দেবো আপনাকে এক মাসের সময় দিয়ে—রাজী থাকেনত আপনার বাড়ির সামনে যে লেটার বকসটা আছে—একটা খামে 'রাজী' কথাটা লিখে ফেলে দেবেন, চিঠি আমি ঠিক পাবো তারপর যা ব্যবস্থা করার করা যাবে—অন্যথায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আপনার ছেলের মৃত দেহ আপনার কাছে পৌছে দেওয়া হবে। পুলিসের সাহায্য না নিলেই ভালো করবেন।
ইতি—জনৈক ব্যক্তি।
বিরূপাক্ষ সেন চিঠিটা শুনতে শুনতে হাসছিল
বললে চমৎকার চিঠি—
কিন্তু মিঃ সেন—
চিঠিটা দিন আমাকে,
রত্না দেবী চিঠিটা বিরূপাক্ষের হাতে দিলেন,
আমি এবারে চলি—কাল সকালে আসবো। হ্যাঁ দরজায় খিল দিয়ে রাখুন আমি না ডাকা পর্যন্ত দরজা খুলবেন না।
—কিন্তু বিপ্লব
—সে ভার ত আমিই নিচ্ছি।
এরা যে জানিয়েছে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জবাব না পেলে—
—৪৮ ঘণ্টার এখনো অনেক দেরি কিন্তু একা থাকতে আপনার ভয় করবে নাত।
—না।
বিরূপাক্ষ সেন বের হয়ে গেল
রত্না দেবী দরজায় খিল তুলে দিলেন।
তখন ভোর হতে খুব দেরী নেই।
অন্ধকার আকাশ ফিকে হয়ে এসেছে—
বোধকরি আধঘণ্টাও হয় নি—দরজার কড়া খট খট করে নড়ে উঠলো,
—কে।
সাড়া নেই।
—কে। সাড়া দিচ্ছ না কেন?
এবারেও সাড়া নেই কোন

(ক্রমশঃ)

Tel. No. 34-2904

With best compliments of :

Butta Steel Company

132, Rabindra Sarani
Calcutta-700007

(Dealers in Iron & Steel)

স্লাডিকে বাগে আনলো
জেড-এক্স-১৩'র প্রথম শিকার
গরমে পাগল হয়েছে!
উঃ, কি গরমটাই পড়েছে!
ব্যারাকুডা আর স্প্রেগেলোর ফ্ল্যাটে টি.ভি সক্রিয় হল
ব্যারাকুডা, স্প্রেগেলো!
ডাক এসেছে
এখনই সদরে চলে যাও...
...লাল সংকেত?
বলে কি?
দুজনে দ্রুত বেরিয়ে আসে
বিশ্ব ব্যাপী সঙ্কট
দেরী নয়!

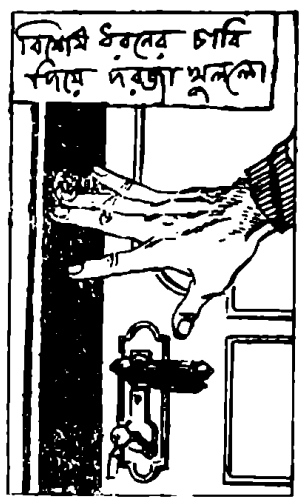

শক্তিশালী মোটর ছুটে চলেছে
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ?
ওয়াম-এর কীর্তি নিশ্চয়!
উইমারহিলে পৌঁছে গেছি!
রাস্তা ফাঁকা
স্থানীয় জন নিরিবিলি
সুদৃশ্য অভিজাত বাড়ির সামনে পৌঁছাল
বিশেষ ধরনের চাবি দিয়ে দরজা খুললো
ব্যারাকুডা বোতাম টেপে - আয়না সরে যেতেই দরজা
কন্দ্রৌলার কোথায়?
ব্যাপার কি?
কন্দ্রৌলার!
কান্দ্রৌলার মেঝেতে বসে হাতে কাঁচা মাংসের..
দেখ এদিকে
খবরদার!
কন্দ্রৌলার লাফিয়ে উঠেছে মুখের কাছে কাঁচা মাংসের তাণ্ড
পাগল হয়ে গেছে?
করছ কি?

[চলবে]

অশরীরী !

শর্মিলা ঘোষ

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রেমণ্ড পুলভার আকস্মিক হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। রেমণ্ডের স্ত্রী জেসিকা ভেঙ্গে পড়েছে। সে তার স্বামীর বিশিষ্ট বন্ধু ও ব্যবসার অংশীদার চার্লসকে বারবার জিজ্ঞাসা করে, রেমণ্ডের হার্টের অসুখ ছিল বলে জানতাম না। সে রকম কথা তো কোনদিন শুনিনি। তুমি কিছু জানতে চার্লস ?

চার্লস ঘাড় নাড়ে, না, জেসিকা সেরকম কথা কোন দিন শুনি নি। জানই তো রেমণ্ড তার নিজের অসুখের কথা কোনদিন কাউকেই বলতো না। একমাত্র তার নিজস্ব চিকিৎসকই তো সে কথা বলতে পারবেন। রেমণ্ডের চিকিৎসক তো শহরে থাকেন। শুনেছি তিনি নাকি কিছুদিনের জন্যে বাইরে গেছেন। এখন তো খোঁজ নেওয়া যাবে না।

রেমণ্ডের শেষকৃত্যের শেষে তার বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীরাও জেসিকা ও চার্লসকে বারবার একই কথা জিজ্ঞাসা করে। চার্লসই জবাব দেয় সে রকম কিছু তো আমরা শুনি নি কোনদিন। তবে এতদিন রেমণ্ডের শরীর বিশেষ ভালো ছিল না।

চিন্তিত স্বরে জেসিকা বলে—কি জানি কি হয়েছিল রেমণ্ডের। কিছুদিন ধরেই ওকে বেশ চিন্তিত আর উদ্‌বিগ্ন দেখাচ্ছিল। অসুস্থ শরীরেই পরিশ্রম করছিল খুব বেশী। বললেও কথা শুনতো না।

শুভানুধ্যায়ীরা সহানুভূতিসূচক শব্দ করে বলেন, অসুস্থ শরীরে বেশি খাটুনিই এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী তা হলে।

রেমণ্ডের মৃতদেহ সমাহিত করার পর কবরখানা থেকে সবাই ফিরছে। সবশেষে শোকের চিহ্ন কালো পোশাক পরা জেসিকা তার সঙ্গে চার্লস। একে একে সবাই চলে গেল। জেসিকা মন্থর ভাবে মাথা নীচু করে নিজের মোটরের দিকে এগিয়ে যায়। চার্লস দরজা খুলে দিতে গাড়ির ভেতরে উঠে যায়।

গাড়িতে ওঠার জন্যে চার্লস পা-দানিতে পা রেখেছে। হঠাৎ বড় একটা পাথর ধপাস করে তার পায়ের কাছ থেকে কিছু দূরে এসে পড়লো।

চার্লস চমকে উঠে সরে যায়। গাড়ির খোলা দরজায় আঘাত পায়।

জেসিকা ভেতর থেকে প্রশ্ন করে কি হোল চার্লস? চার্লস ক্রুদ্ধ চোখে এদিক ওদিক চায়। এ কি ধরনের রসিকতা? কে এ কাজ করলো? এতো বড়ো পাথর ছুঁড়ে মারলো কে?

জেসিকা মুখ বাড়িয়ে দেখে বলে—সর্বনাশ! পাথরটা তোমার পায়ে লাগলে পা ভাঙতো, জখম হতে। কে একাজ করতে পারে?

এদিক ওদিক চায় দুজনে। নাঃ, কেউ কোথাও নেই। ধারে কাছে গাছও নেই, যার আড়ালে লুকিয়ে থেকে কেউ পাথর ছুঁড়ে মারবে। এতো বড়ো পাথর দূর থেকে ছুড়তে গেলে গায়ে যথেষ্ট শক্তি দরকার। কে একাজ করলো? কেন? তার উদ্দেশ্য কি?

সময় কারুর জন্যে অপেক্ষা করেনা। রেমণ্ড-এর মৃত্যুর পর কয়েক মাস কেটে গছে। স্বামীর শোক জেসিকা অনেকটা সামলে নিয়েছে। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। প্রতি রবিবার গির্জায় যায়। রেমণ্ড-এর আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করে, তার কবরে সাদা ফুল রেখে আসে। সামাজিক মেলা-মেশা করে না। আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান বর্জন করে চলে।

সবাই খোঁজ নিতে আসে জেসিকার। সঙ্গত কারণেই চার্লস একটু বেশী আসে। রেমণ্ড-এর ব্যবসার পার্টনার। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই বিশিষ্ট বন্ধু। ব্যবসা নিয়ে দু-চারটে কথা হয়। জেসিকা অবশ্য ব্যবসা নিয়ে এখন মাথা ঘামায় না চার্লস বিশ্বাসী বন্ধু, পার্টনার। উইল টুইলের ঝামেলা মিটে গেলে, শোকের ধাক্কা আর একটু সামলে নিলে জেসিকা ও নিয়ে মাথা ঘামাবে।

চার্লস বলে—এভাবে ঘরকুনো হয়ে বসে থাকলে তোমার শরীর খারাপ হবে জেসিকা। ছয়মাস কেটে গেছে এবার একটু বাইরে বেরোবার চেষ্টা করো। যে চলে গেছে সে তো আর ফিরে আসবে না।

জেসিকা বলে—বাইরে আমোদ আহ্লাদের মধ্যে যেতে ইচ্ছে করে না চার্লস। রেমণ্ড-এর স্মৃতি আমকে ঘিরে রয়েছে। ঘুমের ঘোরে মনে হয় রেমণ্ড যেন আমার পাশে এসে বসেছে—আমায় যেন কি বলতে চাইছে।—তার পরই ঘুম ভেঙ্গে যায়। কি বলতে চায় শোনা হয় না।

চার্লস উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠে—না, না, জেসিকা। দিনরাত ঘরের কোণে বসে চিন্তা করে করে তোমার মাথায় ওইসব উদ্ভট কল্পনা দেখা দিয়েছে স্বপ্নের আকারে। বাইরের হাওয়ায় তোমায় বেরোতেই হবে। সকালবেলা তো আমি আসতে পারবো না। অফিস আছে। বিকেলবেলা বরং একটু বেড়াতে যাওয়া যাবে। সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরবো।

বিকেলবেলা চার্লস-এর সঙ্গে সান্ধ্য ভ্রমণে জেসিকা রাজি হয় নি। সকালটা মন্দ কাটে না জেসিকার। দুপুরটা কাটে বই পড়ে আর ঘুমিয়ে। সন্ধ্যার আগেই চার্লস আসে। ড্রইংরুমে বসে রেডিও শোনে ওরা। মাঝে মাঝে গ্রামোফোনে নাচের বাজনার সঙ্গে নাচে—নাচের পার্টনার চার্লস।

চার্লস অবিবাহিত। জেসিকাই একদিন বলে—এবার তুমি একটা বিয়ে করো চার্লস। এতদিন বিয়ে করনি কেন?

চার্লস বলে—সেরকম মেয়ে পাইনি বলে।

জেসিকা অবিশ্বাসের হাসি হাসে—কি যে বল তুমি। তোমার আবার মেয়ের অভাব হবে? দীর্ঘকায়, সুপুরুষ, চমকার স্বাস্থ্য, ভালো রোজগার করো। তোমার মত ব্যাচেলারকে যে-কোন মেয়ের

অভিভাবকেরাতো বটেই, মেয়েরাও ঝুঁকি নেবে। —নাঃ, আমাকেই ঘটকালি করতে হবে দেখছি।

বাগানে একটা বড় গাছের নীচে বেঞ্চিতে বসে দুজনে কথা হচ্ছিল। চার্লস বলে—ঘটকালি তোমাকে করতে হবে না জেসিকা। আমার মনের মতন মেয়ে আমার পাশেই বসে আছে।

জেসিকা চমকে ওঠে। বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ায়—কি বাজে কথা বলছো চার্লস।

চার্লস বলে—বাজে কথা নয় জেসিকা। তুমি রেমণ্ড-এর স্ত্রী। এতোদিন একথা বলতে পারিনি, আজ তুমিই কথাটা তুললে। রেমণ্ড নেই। আজ আর তোমাকে বলতে বাধা নেই।

জেসিকা ঘাড় নাড়ে—তোমার এসব কথা শুনতে চাই না চার্লস। জেসিকা এগিয়ে যায়। চার্লসও উঠে দাঁড়ায়—দু-পা এগিয়ে গেছে। হঠাৎ গাছের একটা মোটা ডাল মড় মড় শব্দ করে ভেঙ্গে পড়লো—একটু আগে চার্লস যেখানে বসেছিল ঠিক সেইখানে। গাছের ডালপালায় ধাক্কা খেয়ে চার্লস ছিটকে পড়ে। জেসিকা ছুটে আসে। চার্লস উঠে দাঁড়ায়। জামা পোশাক থেকে ধূলো ঝাড়ে। তারপর বেঞ্চের ওপর পড়ে থাকা গাছের ডালটার দিকে চেয়ে থাকে। তার চোখে অজানা এক ভয়ের ছায়া। বিড় বিড় করে বলে—ওখানে বসে থাকলে দুজনেই মারা পড়তুম।

বাগানের সেই ঘটনার পর চার্লস যেন উঠে পড়ে লেগেছে। জেসিকাকে ছাড়া সে আর কাউকেই বিয়ে করবে না, জেসিকা যদি রাজি না হয়, সে আইবুড়োই থেকে যাবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রবিবারে জেসিকা গির্জায় যাবার জন্যে তৈরী হয়েছে, চার্লস গাড়ি নিয়ে হাজির। জেসিকা বিস্মিত হয়—তাকে গির্জায় যেতে বড় একটা দেখেনি জেসিকা। চার্লস বলে জেসিকার নিষ্ঠা দেখে তারও মত বদলেছে। এখন থেকে সে প্রতি রবিবার গির্জায় যাবে।

জেসিকা বাইরে এসে চার্লসের গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। চার্লস সদর দরজা ভেজিয়ে রেখে সিঁড়ি দিয়ে সবে নেমেছে, ওপর থেকে কার্নিশের একটা অংশ ভেঙ্গে পড়লো। একটু আগে চার্লস যেখানে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেইখানে। চার্লস লাফিয়ে সরে আসতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে। তার পোশাক ধূলো-কাদায় নোংরা হয়ে যায়। জেসিকা ওর অবস্থা দেখে বলে তুমি বাড়ি ফিরে যাও চার্লস। গির্জায় যাওয়া তোমার বরাতে নেই। চার্লস চিন্তিত হয়ে পড়েছে। জেসিকাকে নিয়ে বেড়াতে যাবার চেষ্টা করতে গেলেই একটা না একটা দুর্ঘটনা ঘটছে। বাগানে পায়চারি করতে গিয়েও নিস্তার নেই। লতায় পা জড়িয়ে চার্লস হোঁচট খাচ্ছে, পা পিছলে কাঁটা ঝোপের মধ্যে পড়ছে। কয়েকবার গাছের সঙ্গে ধাক্কাও খেয়েছে। ড্রইংরুমে বসে গল্প করেও নিস্তার নাই। হঠাৎ চেয়ারের পায়া ভেঙ্গে পড়ে। চায়ের পট উলটে গিয়ে চার্লসএর পোশাক নষ্ট হয়ে যায়।

সেদিন ডিনার খেতে বসে চার্লস বলে—ব্যাপার কিছু বুঝছি না জেসিকা। রেমণ্ড নেই। তুমি এভাবে একলা জীবনটা কাটাবে কি করে? তুমি যদি মত করো তাহলে বিয়ের ব্যাপার তাড়াতাড়ি সেরে ফেললে ভালো হয়।—একটু চুপ করে থেকে চার্লস বলেন—ভূতটুত বিশ্বাস করি না। তা হলে বলতুম—কোনও প্রেতাত্মা তোমার সংগে আমার বিয়ে যাতে না হয়, সে উদ্দেশ্যে আমাকে নানা ভাবে ভয় দেখাচ্ছে।

জেসিকা কোন কথা বলে না। হঠাৎ ওরা দুজনে শুনতে পায় কোথাও ঠক্‌ঠক্ করে শব্দ হচ্ছে, চমকে ওঠে দুজনেই। বাড়িতে চোর ঢুকেছে?

জেসিকা উঠে দাঁড়ায়। তার পেছন চার্লস। বলে —একলা যেওনা জেসিকা। যদি চোর হয়—

জেসিকা কথা শোনে না। কোথা থেকে শব্দটা আসছে? —নাঃ। নীচের কোন ঘর থেকে নয়। শব্দটা তাকে যেন ডাকছে। খানিকটা সম্মোহিতের মতন জেসিকা শব্দ অনুসরণ করে দোতলায় উঠে যায়। রেমণ্ডের শোবার ঘরের কাছে আসতে মনে হয় এই ঘর থেকেই শব্দ আসছে। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকে। পিছনে চার্লস। —নাঃ। এ ঘর না। পাশের ঘর।

পাশের ঘরটা রেমণ্ড তার স্টাডিরুম বা ছোট খাটো অফিস ঘর করেছিল। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতো। রেমণ্ড মারা যাবার পর থেকে এ ঘরটা ব্যবহার করা হয় নি।

জেসিকা দরজা খুলে ঢোকে। শব্দটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—এই ঘরেই শব্দ হচ্ছে। রেমণ্ড যে টেবিলে বসে কাজ করতো, জানলার ধারে সেই টেবিলের ওপর একটা হিসেবের খাতা খোলা রয়েছে।

জেসিকা সম্মোহিতের মতন এগিয়ে যায়—টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে হিসেবের খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে। ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে।

পেছন থেকে চার্লস জিজ্ঞেস করে—ব্যাপার কি জেসিকা?

হিসেবের মোটা খাতাটা বন্ধ করে জেসিকা উঠে ঘুরে দাঁড়ায় চার্লসের দিকে। তার চোখে তীব্র ঘৃণা, বিতৃষ্ণা। তীক্ষ্ণ স্বরে বলে, তুমি বন্ধুবেশী একটা শয়তান চার্লস। রেমণ্ড তোমায় বিশ্বাস করতো আর সেই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তুমি দু-হাতে টাকা সরিয়েছে।

চার্লস বিস্ময়ের ভান করে বলে—কি যা তা বলছ জেসিকা?

হিসেবের খাতাটা তুলে নিয়ে জেসিকো বলে—আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করা বৃথা চার্লস। মনে রেখো আমি পাস করা অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এটা রেমণ্ডের নিজস্ব হিসেবের খাতা। তুমি কি ভাবে দিনের পর দিন টাকা সরিয়েছি তার খুটিনাটি এই খাতায় লেখা আছে।

জেসিকা রাগে দুঃখে হাঁপাচ্ছে—যাকে সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করতো, বন্ধুর মুখোশ পরা সেই লোকের শয়তানির বহর দেখে রেমণ্ড নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। তার জন্যেই সে হার্টফেল করে মারা গেছে। এই হিসেবর খাতাই তোমাকে জেলে পাঠাতো। এখন বুঝছি—রেমণ্ডের আত্মাই আমাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছে—দুর্ঘটনা-গুলো তারই হুশিয়ারী।

জেসিকো হিসেবের খাতা নিয়ে এগিয়ে যায়। চার্লস পথ আটকায়—রেমণ্ড সন্দেহ করেছিল আন্দাজ করেছিলাম। সে কোনও সাক্ষ্য রেখে গেছে কিনা জানতে পারি নি। ওই খাতাটা আমার চাই। আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে সব সাক্ষ্য প্রমাণ লোপ করে দেব!

খানিকটা ধ্বস্তাধ্বস্তি! জেসিকার হাত থেকে খাতাটা কেড়ে নেয় চার্লস। খাতাটা পুড়িয়ে দিলে আমার বিরুদ্ধে কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ থাকবে না। তারপর তোমার পালা। রেমণ্ডের মতন তোমারও আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

জেসিকা অসহায়ভাবে চেয়ে থাকে। গায়ের জোরে চার্লসের কাছ থেকে খাতাটা কেড়ে নেবার ক্ষমতা তার নেই। চার্লস খুশী মনে এগিয়ে যাচ্ছে।

সিলিং থেকে একটা ভারী বাতিদান ঝুলছিল। চার্লস সেই বাতিদানের নীচে আসতেই হুড়মুড় করে বাতিদানটা চার্লসের মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়ে—

(শেষাং ১৩০ পৃষ্ঠায়)

ভূত না অতৃপ্ত আত্মা.... !

মহীয়সী ব্যানার্জী

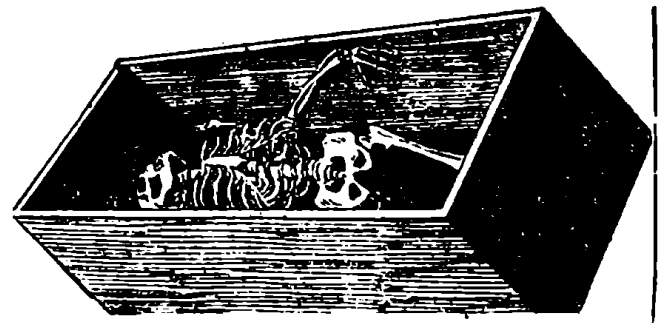

মধ্য যুগের ইংলণ্ড। তখন মোটর গাড়ির প্রচলন হয় নি, ট্রেনও চলতো না। এক শহর থেকে অন্য শহরে যাবার উপায় ছিল ঘোড়ায় চড়ে কিম্বা স্টেজ কোচে। যাত্রী, মালপত্র, চিঠিপত্র নিয়ে যাওয়া হতো এই স্টেজ কোচে। চারটে ঘোড়া স্টেজ কোচ টেনে নিয়ে যেতো। ভেতরে ঠাসাঠাসি করে ছ-জন বসতে পারে, ওপরে ড্রাইভারের পাশে আর একজন। স্টেজ কোচ-গুলোর যাত্রাপথ ছিল পঞ্চাশ ষাট মাইল। মাঝে মাঝে ঘোড়া বদলাবার, যাত্রীদের আহার ও পানীয় সরবরাহের জন্যে ছিল চটি। সাময়িক বিশ্রাম। তারপর আবার নতুন ঘোড়া জুতে স্টেজ কোচ ছুটতো। গন্তব্য স্থলে পৌঁছে ড্রাইভারের ছুটি। বিশ্রাম করে আবার ফিরে আসে। অন্য একটা স্টেজ কোচ যাত্রী, মালপত্র ইত্যাদি নিয়ে আর একটা শহরের দিকে চলে যায়। দিনটা ছিল শনিবার। অমাবস্যার রাত্রি। সড়ক দিয়ে স্টেজকোচ ছুটে চলেছে। অর্ধেক পথ এসেছে আরও মাইল ত্রিশ যেতে হবে। স্টেজ কোচে একজন মাত্র আরোহী, রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী ডেভিড ক্রিস্টোফার। দূরের শহরের গির্জার দায়িত্ব নেবার জন্যে যাচ্ছেন। কালো পোশাকে আবৃত দেহ। গলা থেকে সরু সোনার চেনে ঝুলছে একটা ক্রুশ।

হঠাৎ ড্রাইভার সজোরে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে। পাদ্রী ডেভিডের তন্দ্রা এসেছিল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে জেগে ওঠেন, জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন কি হল ড্রাইভার।

ড্রাইভার সীট থেকে নেমে এসেছে। বলে কে একজন উজবুক রাস্তার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত একটা মোটা দড়ি টাঙিয়ে রেখেছে। ভাগ্যিস ওই বাড়ির একটা আলোর রেখা দড়িটার ওপর এসে পড়েছিল!

পাদ্রী কোচ থেকে নেমে আসেন। কিছু দূরে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। মূল সড়ক থেকে একটা পথ বাড়ির দিকে চলে গেছে। জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। বাড়ির লোকেরা ঘুমোয় নি!

পাদ্রী ডেভিড বেশ রেগে গেছেন। ড্রাইভারকে বলেন, তুমি একটু অপেক্ষা করো ড্রাইভার। আমি দেখছি রাস্তা বন্ধ করে কে দড়ি টাঙিয়ে রেখেছে! পাদ্রী এগিয়ে যান। বাড়ির সদর বন্ধ। জোরে জোরে ধাক্কা দিতে থাকেন। খানিক বাদে ভেতর থেকে একজনের গলা শোনা যায়, এত রাত্রে কে

ডাকাডাকি করছেন ? কি চাই আপনার ?

পাদ্রী বলেন, আমি পাদ্রী ডেভিড। দরজা খুলুন, বাইরে আসুন। দরকার আছে।

দরজা খুলে আলো হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন প্রৌঢ়। অস্পষ্ট আলোতে পাদ্রী দেখেন, তার পেছনে একজন মহিলা, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

পাদ্রী ডেভিড একটু উচ্চস্বরে বলেন—রাস্তা বন্ধ করে দড়ি টাঙিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কি ?

গৃহস্বামী চিন্তিত স্বরে বলেন—রাস্তা বন্ধ করে কে দড়ি টাঙিয়ে রেখেছে জানি না তো !

পাদ্রী ডেভিড বলেন—আসুন নিজের চোখে দেখে যান।

গৃহস্বামীর নাম চার্লস ওয়াট। পাদ্রীর সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সদর রাস্তায় উঠলেন। রাস্তার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত দড়ি টাঙানো। অন্ধকার রাতেও দড়িটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—মনে হচ্ছে দড়িটা থেকে আলো বেরোচ্ছে।

চার্লস এগিয়ে এসে দড়িটা ধরে টানতে যান। একি ! হাতটা দড়ির ওপর দিয়ে ঘুরে এল হাতে তো কিছু ঠেকলো না !

পাদ্রীও চিন্তিত। তিনিও দড়ি ধরে টানতে গেলেন। হাওয়ার ভেতর দিয়ে হাতটা ঘুরে এলো হাতে কিছুই ঠেকেনি—অথচ চোখের সামনে দড়িটা দেখতে পাচ্ছেন !

চার্লস চিন্তিত স্বরে বলেন—ভৌতিক ব্যাপার পাদ্রী। দড়ি দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। অথচ দড়ি নেই ! দেখছেন, দড়িটা থেকে একটা আলো বেরোচ্ছে ?

চিন্তিত স্বরে পাদ্রী বলেন—স্টেজ কোচটা-থামাবার জন্যেই দড়ির আবির্ভাব ! এর আগে এরকম ঘটনা ঘটেছিল ?

চার্লস ঘাড় নাড়ে—না। কখনও ঘটেনি ?

পাদ্রী ডেভিড আপন মনেই বলেন—তাহলে। আজ হঠাৎ এরকম হলো কেন ? গাড়িতে আমি ছাড়া তো আর কেউ নেই ! আমাকেই থামতে বলছে ? কেন ? কোনও অতৃপ্ত আত্মা—

চার্লস চমকে ওঠে সম্ভ্রমের সঙ্গে বলে—পাদ্রী, অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, ঠাণ্ডায়। যদি দয়া করে গরীবের কুঁড়েতে কিছুক্ষণের জন্যে আসেন, তাহলে একটা ঘটনার কথা বলবো—হয়তো এই রহস্যের সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। ড্রাইভারও আসুক গাড়ি রেখে। গরম পানীয় খেয়ে গা গরম করে নেবে।

পাদ্রী আর ড্রাইভার দুজনেই চার্লস-এর পিছন পিছন বাড়ির ভেতরে এলেন। ফায়ার প্লেসের সামনে আরাম কেদারায় পাদ্রী বসে গরম চা খাচ্ছেন, একটু দূরে আর একটা চেয়ারে বসে ড্রাইভার গরম চা খাচ্ছে। চার্লস এর স্ত্রী লুসিও একটা চেয়ারে বসে আছেন।

চার্লস বলে—বছর তিন চার আগের কথা। দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি, ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। দরজা জানলা সব বন্ধ করে, ফায়ার প্লেসের ধারে বসে আগুন পোয়াচ্ছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম, দরজায় কে যেন ধাক্কা মারছে। এদিকটায় লোক বসতি কম। বাড়িগুলো ছাড়া ছাড়া। চোর ডাকাতের উপদ্রব নেই। আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া বাড়তি আর কেউ নেই। এত রাত্রে কে দরজায় ধাক্কা মারবে ?

প্রথমে ভেবেছিলাম আমাদের শোনার ভুল। ঝড়ের দাপটে দরজা নড়ছে। তারপরই বুঝলাম সত্যিই এই দুর্যোগের রাতে কে একজন দরজায় ধাক্কা মারছে। দরজা খুলতেই বছর চাল্লিশ বয়সের এক ভদ্রলোক প্রায় হুমড়ি খেয়ে ভেতরে ঢুকলো। বৃষ্টির জলে পোশাক জুতো সব ভিজে

সপ্ সপ্ করছে। দরজা বন্ধ করে ভদ্রলোককে বাথরুমে নিয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী লুসি আমারই পুরানো পোশাক এনে দিল। পোশাক বদলে তিনি আগুনের ধারে বসলেন। খাওয়া দাওয়ার পর বাড়তি ঘরে ভদ্রলোককে শুতে দিলাম।

সকালে ভদ্রলোক ব্রেকফাস্ট খেতে নামে নি। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি জ্বরে বেঁহুশ। ডাক্তার আনলাম, নিউমোনিয়া। চিকিৎসা করেও কোন ফল হল না। ভদ্রলোক বুঝতে পেরেছেন, তাঁর শেষ সময় আসন্ন। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন একজন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীর জন্যে! আমরা প্রোটেস্ট্যাণ্ট কোনও রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীর খোঁজ পেলাম না।

জামা পোশাক বা সঙ্গের কাগজপত্র থেকে ভদ্রলোকের কোনও পরিচয় পেলাম না। মনে হল জাতে ইংরেজ নন। শেষকৃত্যের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হল। ওদিকে ওই খোলা জায়গায় তাঁকে কবর দেওয়া হল। চার্লস চুপ করলো। একটু চা খেয়ে আবার বলে কবর দেওয়ার পর থেকে শুরু হল ভৌতিক কাণ্ড। যে ঘরে অজানা ভদ্রলোক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই ঘরে কে যেন পায়চারি করছে। দরজা খুলে দেখি কেউ নেই। লুসি হঠাৎ বলে ওঠে দেখ! দেখ?

বিছানা-ঢাকা দেওয়া চাদরটা ঠিক মাঝখানটায় কে যেন কাঁচি দিয়ে কেটে একটা ক্রুশ চিহ্ন এঁকে রেখেছে। তারপর জানলার পরদা কেটেও কে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে রেখে গেল। বিছানার চাদর, জানলার পরদা বদলে দিলুম। পরদিন একই ঘটনা—কাঁচি দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকা। তারপর থেকে চাদর পরদা বদলাইনি, দরজায় চাবি দিয়ে রেখেছি!

পাদ্রী ওঠে দাঁড়ান। বলেন—ঘরটা দেখতে পারি মিঃ ওয়াট? আর সেই ক্রুশ চিহ্ন আঁকা পরদা, চাদরগুলো?

আলো হাতে চার্লস ও লুসি পথ দেখিয়ে এগিয়ে যায়। পিছনে পাদ্রী ডেভিড, তাঁর পিছনে ড্রাইভার!

ঘরের দরজা খুলে পাদ্রীকে ভেতর আসতে বলে চার্লস। দরজার গোড়ায় এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে পাদ্রী তাঁর মাথার টুপি খুলে ফেলেন। তারপর ধীর পায়ে ঘরের ভেতর ঢুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকা বিছানার চাদর, জানলার পরদা সব কিছু খুঁটিয়ে দেখেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চার্লসের দিকে ফিরে বলেন—হতভাগ্য অতৃপ্ত আত্মা!

চার্লসের হাতের আলো পাদ্রীর মুখের ওপর পড়েছে। এতোক্ষণ টুপীর আড়ালে পাদ্রীর মুখ সে ভালো করে দেখতে পায়নি। খানিকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে পাদ্রীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে ওঠে, আপনি? কি আশ্চর্য!

পাদ্রী জিজ্ঞাসু চোখে চার্লসের দিকে তাকান! চার্লস সামলে নিয়ে বলে—বসবার ঘরে চলুন। অদ্ভুত যোগাযোগ! সব কথাই বলবো আপনাকে।

বসবার ঘরে সবাই আগুনের পাশে বসেছে। পাদ্রী তখনও তাঁর টুপিটা হাতে ধরে রেখেছেন। বলেন—এবার বলুন তো অদ্ভুত দৃশ্যটা কি হল? চার্লস বলে, এইসব ভৌতিক কাণ্ড দেখে আমরা দুজনেই প্রথমটায় বেশ ভয় পেয়ে ছিলাম। ওই ঘরে কে যেন চলাফেরা করে। মাঝে মাঝে মৃদু গোঙানির শব্দ কানে আসে। কে যেন রোগ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

ভূত অশরীরী আত্মা যেই হোক না কেন, ওই ক্রুশ চিহ্ন আঁকা ছাড়া আর কোনও উপদ্রব করে না। গা সওয়া হয়ে গেল।

গত সপ্তাহে পর পর তিন দিন স্বপ্ন দেখলাম।

ওই অজানা লোকটির কবরের ধারে পাদ্রীর পোশাক পরা একজন দাঁড়িয়ে আছেন হাতে ছোট একটা বই, কালো চামড়ায় বাঁধানো! পাদ্রীর ঠোঁট নড়ছে। তারপর তিনি ঘাড় হেঁট করে ধীর পায়ে বাড়ির দিকে আসছেন এবার মুখ তুললেন—একটা আলোর ঝলক তাঁর মুখের উপর পড়লো!—সেই অচেনা পাদ্রীর মুখ আর আপনার মুখ একই—আপনিই সেই অচেনা পাদ্রী! দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাদ্রী উঠে দাঁড়ান। মাথায় টুপি পরে বলেন—মেরী মাতার অপার করুণা। পকেট থেকে কালো চামড়ায় বাঁধানো ছোট একটা বই বের করে বলেন—চলুন। কবরটা কোথায় দেখিয়ে দেবেন!

কবরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন পাদ্রী ডেভিড। বাইবেলের নির্দিষ্ট জায়গা খুলে, শেষ-কৃত্য অনুষ্ঠানের শ্লোকগুলি উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করেন! আবৃত্তির শেষে বাইবেলটি সযত্নে পকেটে পুরে কবরের ওপর দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাদ্রী ডেভিড বলেন—অতৃপ্ত আত্মা, মেরী মাতার অপার করুণায় আজ তুমি তৃপ্ত। তোমার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছি বলে আজ আমিও ধন্য।

(অশরীরী ১২৬ পৃষ্ঠার পর)

চার্লসের ঘাড়ের ওপর। তার কাঁধে আঘাত লেগেছে। হাত ভেঙ্গে গেছে। হিসেবের খাতাটা হাত থেকে ছিটকে পড়তেই জেসিকা ছুটে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নেয়।

চার্লস মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। জেসিকা হিসেবের খাতাটাকে নিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। খানিক বাদেই চার্লস শুনতে পায় জেসিকা মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

ঠক্‌ঠক্ শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। রেমণ্ডের অশরীরী আত্মা বন্ধুবেশী বিশ্বাসঘাতকের মুখোশ খুলে দিয়েছে—তার কাজ শেষ হয়েছে।

Space Donated by

A Well Wisher

চার্লস ডিকেন্স

অলিভার টুইস্ট

ভাষান্তর : ডঃ রবীন্দ্রনাথ বসু

১

অলিভার টুইস্টের জন্ম এক অনাথ আশ্রমে। জন্মমুহূর্তেই সে একটু কেঁদেছিল। জীবনে তাকে কত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে সে বোধশক্তি যদি তখন তার থাকত তাহলে হয়ত তার কান্না আর থামত না। অনাথ অলিভার যেন দুঃখের বোঝা নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিল।

তার অসুস্থ মা সদ্যোজাত শিশুকে দেখতে চাইলেন। বললেন, শিশুকে দেখে আমি শান্তিতে মরতে চাই।

তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ডাক্তার ও তাঁর পরিচারিকা এক বৃদ্ধা। দুজনেই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এত কম বয়সে মরার সময় আসেনি। সুস্থ হয়ে উঠে ছেলেকে মানুষ করতে হবে। তারপর ডাক্তার শিশুটিকে মায়ের কাছে দিলেন।

মা শিশুর মুখে শেষ চুম্বন দিয়ে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়লেন। জন্মের পরেই অলিভার তার মাকে হারাল। তার পিতৃ-পরিচয়ও কেউ জানেনা।

সেখান থেকে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল মিসেস ম্যানের কাছে। সেখানে আরও বিশ-তিরিশটা ছেলে ছিল। ইনি গরিব ছেলেদের মানুষ করতেন। প্রতি সপ্তাহে ছেলেদের দেখাশুনা করার জন্য মাথাপিছু কিছু করে খরচ পেতেন। কিন্তু তিনি তা নিজের জন্যেই রেখে দিতেন। ছেলেদের খুব অল্প খাইয়ে রাখতেন। খিদের জ্বালা মেটাতে তাদের ভাগ্যে জুটত মার। হতভাগ্য ছেলেরা স্নেহ ভালবাসা কি বস্তু কোনদিন জানতে পারেনি।

অলিভার ন'বছর মিসেস ম্যানের কাছে ছিল। একবার সে আর দুজন ছেলে খাবার খেতে চায়। এই দুঃসাহসের শাস্তিস্বরূপ তাদের এক অন্ধকার ঘরে পুরে রাখা হয়। এমনি আরো কয়েকবার

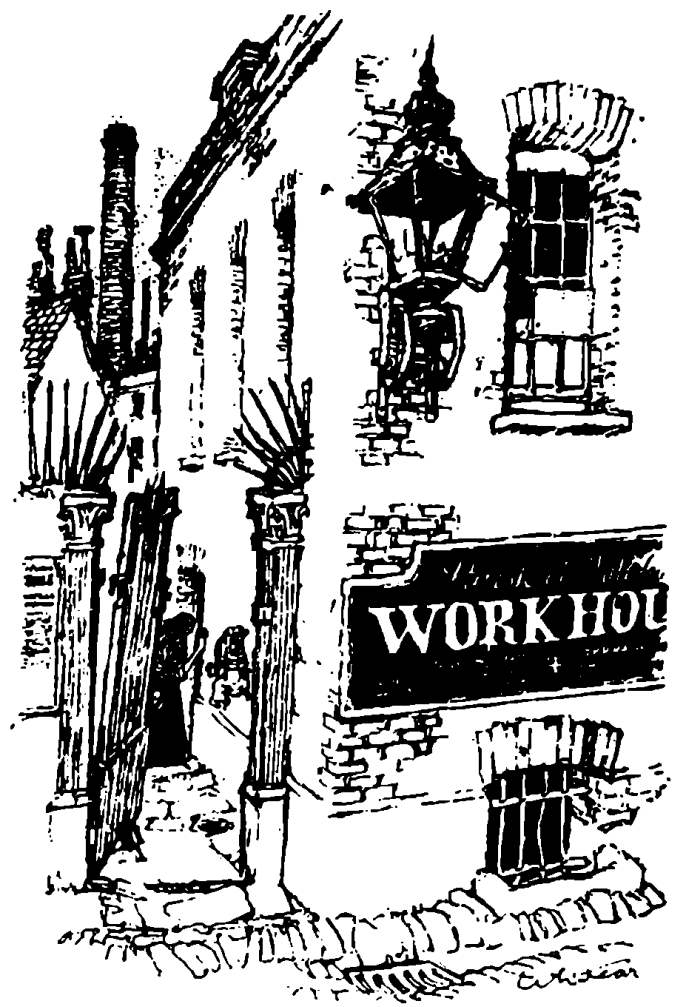

অলিভারের জন্মস্থান 'অনাথ আশ্রম'

তাকে অন্ধকার ঘরে দিন কাটাতে হয়েছে। একেই সে রোগা তার ওপর অত্যাচার তাকে আরো বেশি ক্ষীণ ও দুর্বল করে তুলল। কিন্তু ভগবান তাকে যথেষ্ট সহ্যশক্তি দিয়েছিলেন তাই সে অন্য ছেলেদের মত অকালে মারা যায়নি।

একদিন মিঃ বাম্বল সেখানে এলেন। তাঁকে দেখে মিসেস ম্যান চমকে উঠলেন। তিনিই অনাথ-আশ্রম দেখাশুনা করতেন। খুব মোটা চেহারা, মাথায় সোলার টুপি, হাতে বেতের লাঠি। নিজেকে একজন হোমরা-চোমরা লোক বলে মনে করতেন।

বাম্বল জানালেন, অলিভার টুইস্ট নামে যে ছেলেটিকে এখানে দেওয়া হয়েছিল, তার কাজকর্ম করার মত এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তার মা-বাবার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারা যায়নি।

তাহলে কি করে তার নাম হল? জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ম্যান।

আমিই তার নাম দিয়েছি—উত্তর দিলেন বাম্বল।

আপনি?

হ্যাঁ। বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী অনাথ ছেলেদের নাম দিয়ে থাকি। যেমন, 'S' 'সুইব্‌ল'—অলিভারের আগের ছেলেটির নাম। তার বেলায় পড়ল 'T'—অর্থাৎ 'টুইস্ট'। 'Z' পর্যন্ত নামের তালিকা তৈরী আছে। তারপর আবার 'A' থেকে শুরু হবে।

ওঃ, আপনার মাথায় ত' খুব বুদ্ধি আছে। আশ্চর্য হয়ে বললেন ম্যান।

বাম্বল খুব খুশী হলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা—এখন কাজের কথা হোক। আমি এসেছি অলিভারকে নিয়ে যেতে। তাকে এখানে নিয়ে আসুন আমি দেখতে চাই।

আমি এখুনি তাকে আনছি—বললেন ম্যান।

সেই সময়ে অলিভারকে একটা অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। তাড়াতাড়ি তাকে ঘর থেকে বার করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে বাম্বল-এর সামনে হাজির করা হল।

তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে, অলিভার?—বাম্বল জিজ্ঞেস করলেন।

তার মনের অবস্থা তখন এমন হয়েছিল এখান থেকে যে-কোন জায়গায় যাবার জন্যে সে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ম্যানের চোখ-পাকানো মুখের দিকে তাকিয়ে সে কেঁদে ফেলল।

বাম্বল ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, মিসেস ম্যান মাঝে মাঝে গিয়ে তোমাকে দেখে আসবেন।

অলিভারকে তিনি তার জন্মস্থান অনাথ-আশ্রমে নিয়ে গেলেন। সেদিন ছিল তার জন্মদিন।

অনাথ-আশ্রমে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। সে তুলনায় অতি সামান্য খাবার মিলত। —যা ভস্মে ঘি ঢালার মত। খিদে আরো বেড়ে যেত। খাবার বরাদ্দ ছিল দিনে তিনবার এক বাটি পাতলা ঝোল তাতে সামান্য এক একটুকরো মাংস থাকত। আর প্রতি রবিবার আধখানা রুটি। ছেলেরা পরিপূর্ণ খাদ্য না পেয়ে ক্রমশ রোগা হয়ে যেতে লাগল। জামা গায়ে ঢলঢল করতে আরম্ভ করল। এইভাবে অনেকেই মারা গেল।

প্রতিদিন খাবারের সময়ে এক মোটাসোটা লোক একটা বড় গামলায় জলের মত সেই ঝোল নিয়ে একধারে দাঁড়াত। ছেলেরা বাটি হাতে নিয়ে তার সামনে আসত। লোকটি একহাতা করে ঝোল প্রত্যেক বাটিতে ঢেলে দিত। দু'বার চাইবার সাহস কারও ছিল না। ছেলেরা ঝোলের বাটি চেটেই পরিষ্কার করত। জল দিয়ে ধোবার আর

দরকার হত না।

খিদের জ্বালায় একটি ছেলে ত একদিন বলেই ফেলল, তার পাশে যে শোবে তাকেই খেয়ে ফেলবে। তার মুখের দিকে চেয়ে, ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দেখে ছেলেরা ভয়ে শিউরে উঠল। ভাবল তার পক্ষে এই জঘন্য কাজ করা কিছুই আশ্চর্যের নয়।

তিনমাস এভাবে চলার পর অলিভার একদিন মরিয়া হয়ে উঠল। প্রতিদিনের মত সন্ধ্যার সময় লোকটি খাবার নিয়ে প্রত্যেকের বাটিতে একহাতা করে ঝোল দিল হঠাৎ অলিভার এগিয়ে এসে বলল,—আমায় আর এক বাটি ঝোল দিন।

লোকটি বিস্মিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল —কি বলছ?

নির্ভয়ে অলিভার বলল,—আমাকে আরো দিন।

কি! আরো চাই। —লোকটি যেন বিশ্বাসই করতে পারল না! অলিভারকে একহাতে চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল। বাম্বল ও আরো কয়েকজন সেখানে ছুটে এলেন।

কি ব্যাপার! বাম্বল জিজ্ঞেস করলেন।

ছেলেটা আরও খেতে চায়! লোকটি বলল।

একজন বলে উঠল,—কি ভীষণ ব্যাপার! ছেলেটা বড় হলে নির্ঘাত ফাঁসিতে লটকাবে।

তারা ঐ ক্ষুদে বিদ্রোহীকে সাতদিন অন্ধকার ঘরে পুরে রাখল। রোজ একবার করে তাকে সকলের সামনে এনে বেত মারা হত। সারাদিন সে কাঁদত, রাত্রে যন্ত্রণায় তার ঘুম হত না।

২

একদিন বাম্বল অনাথ-আশ্রমের গেটের বাইরে বসে আছেন। এমন সময়ে পাতলা ছিপছিপে চেহারা পুরনো কালো রঙের কোট-প্যান্ট পরা একজন বয়স্ক লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। লোকটির নাম সাওয়ারবেরি। তিনি কফিন তৈরি করেন। যেসব গরিব ছেলেরা অনাথ-আশ্রমে মারা যায় তাদের মৃতদেহ সেই কফিনে পুরে কবর দেওয়া হয়।

যে দুজন মহিলা গত রাত্রে মারা যান তাদের কফিন ত আমিই তৈরি করেছি—মিঃ সাওয়ারবেরি বললেন।

হাঁ, এতে ত আপনার অনেক পয়সা—বাম্বল জবাব দিলেন।

আপনি কি তাই মনে করেন? যে দাম দেওয়া হয় তা নিতান্তই অল্প—।

অলিভার আর এক বাটি ঝোল চাইছে

কফিনগুলিও সেই রকম তৈরী হয়।

একথা শুনে সাওয়ারবেরি খুব মজা পেলেন আর অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তার পর বললেন, আসল কথাটা কি জানেন, যেভাবে তাদের খাওয়ানো হয় তাতে ঐ রকম সরু ও ছোট কফিন তৈরি করা হয়। কিন্তু কাঠের যে অনেক দাম পড়ে যায়! মোটা লোকের জন্যে আমাকে বড় কফিন তৈরি করতে হয়। তাতে আমার কিছুই থাকেনা।

যাই হোক, পাঁচ পাউণ্ডের বিনিময়ে ছেলে নেবার মত আপনার কোন লোক জানা আছে। এই বলে বাম্বল গেটের ওপরে ঝোলানো একটা নোটিশ দেখালেন।

হ্যাঁ, সেইজন্যেই ত আমি এখানে এসেছি। গরিবদের জন্যে আমি অনেক করি। তাদের কাছ থেকেও আমি কিছু দাবি করতে পারি। আমিই ছেলেটিকে নেব।—বললেন সাওয়ারবেরি।

মিসেস সাওয়ারবেরি অলিভারকে দেখে আঁতকে উঠলেন। বললেন, এতটুকু ছেলে! আমাদের খেয়ে-পরে বড় হবে। আমাদের টাকার শ্রাদ্ধ হবে! তারপর তিনি বিরক্তিভরে ঝিকে ডেকে বললেন, কুকুরের জন্যে যে মাংস আছে, ছোঁড়াটাকে খেতে দাও।

মাংসের কথা শুনে অলিভারের জিভে জল এল। গোগ্রাসে সে সেই মাংসের ছাঁট গলাধঃকরণ করল। তারপর তাকে অন্ধকার দোকান ঘরে একটা কফিন বাক্সের মধ্যে শুতে দেওয়া হল। তার আশেপাশে চারধারে কফিন বাক্স ছড়ান—কোনটা সমাপ্ত, কোনটা অর্ধ-সমাপ্ত। কাঠের টুকরোগুলো যেন ভূতের মত দেওয়ালে দাঁড় করানো। একটা বিশ্রী গন্ধ ঘরটাকে ভরিয়ে তুলেছে। মনে হত সে যেন একটা কবরের মধ্যে শুয়ে রয়েছে। ভাবত এখানেই যেন তার শেষ নিদ্রা হয়।

সেখানে সকলেই তাকে অনাথ বলে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করত। অলিভার তার প্রভুকে খুশী করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু স্বস্তি পেলনা। মিসেস সাওয়ারবেরি তাকে মোটেই পছন্দ করতেন না। নোয়া ক্লেপোল বলে একটা ছেলের অধীনে তাকে কাজ করতে হত। সেই তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলল। তাকে সবসময় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, এমনকি মারধোর করতেও কুণ্ঠা বোধ করত না। নোয়া যদি না থাকত তাহলে হয়ত সে নিজেকে সেই অবস্থায় মানিয়ে নিতে পারত। কিন্তু একদিন তাকে সে ঘর ছাড়তে বাধ্য করল।

তার মৃত মায়ের সম্বন্ধে অনেকে কটুকথা শোনাত। নোয়া তার বিষয়ে সব শুনেছিল। মজা করবার জন্যে একবার তাকে জিজ্ঞেস করল, ওহে, তোমার মা কোথায়?

মা মারা গেছেন—কথাটা বলেই দুঃখে অলিভারের চোখে জল এল। আহা বেচারা! কাঁদছ কেন?—নোয়ার বেশ আনন্দই হচ্ছিল।

আমার মার সম্বন্ধে কোন কথা বলনা—।

কেন, বলবনা কেন? ওহে অনাথ, অত রোখ দেখিও না। আমাদের দয়ায়ই তুমি আছ। শুনেছি তোমার মা নাকি দুশ্চরিত্রা ছিলেন?

কি বললে?—অলিভারের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ল।

একজন দুশ্চরিত্রা, অনাথ। মরে গিয়ে ভালই হয়েছে—ঠাট্টা করে বলল নোয়া।

কথা শুনে অলিভারের চোখ মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। নিজেকে সামলাতে না পেরে ক্ষেপে উঠে নোয়ার গলা টিপে ধরল। তাকে ঝাঁকানি দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল।

নোয়া চিৎকার করে উঠল—বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! অলিভার পাগল হয়ে গেছে! আমাকে মেরে ফেলল!

চিৎকার শুনে মিসেস সাওয়ারবেরি ছুটে এলেন। পেছনে বাড়ির ঝি। তাদের আসতে দেখে নোয়া আরো জোরে চিৎকার করে উঠলো। ঝি তাড়াতাড়ি অলিভারকে টেনে এনে মারতে শুরু করল। তার দেখাদেখি মিসেস সাওয়ারবেরি এবং নোয়াও তাকে বেদম পেটাতে লাগল। যখন তাদের আর হাত চলছে না, তখন তাকে রান্নাঘরের পেছনে পাম্পঘরে বন্ধ করে রেখে দিল।

মিসেস সাওয়ারবেরি নোয়াকে পাঠালেন বাম্বলকে ডেকে আনতে। নোয়া বাম্বল এর কাছে গিয়ে অলিভার সম্বন্ধে বাড়িয়ে অনেক কথা বলল। সে বাড়ির ঝি ও মিসেস সাওয়ারবেরিকে খুন করতে পর্যন্ত গেছিল। আর আমাকে, উঃ!—এমনভাবে নোয়া হাবভাব দেখালো যেন তাকে কতই না মেরেছে।

বাম্বল কারখানায় ছুটে এলেন। অলিভার যে ঘরে বন্ধ ছিল তার সামনে গিয়ে গম্ভীর গলায় ডাকলেন —অলিভার!

অলিভার ভেতর থেকে চিৎকার করে বলল—আমাকে ঘর থেকে বের করুন।

এমন সময়ে মিঃ সাওয়ারবেরি এলেন। তিনি সব শুনলেন। তারপর অলিভারকে ঘর থেকে বার করে আনলেন। অলিভারের ওপর তাঁর একটু মায়া পড়েছিল। তিনি হয়ত তাকে কিছু করতেন না। কিন্তু স্ত্রীর কান্নায় বাধ্য হয়ে তাকে তখনকার মত ঘরে বন্ধ করে রাখতে হয়েছিল। রাত্রে শুয়ে সে খুব কাঁদল। শেষে মতস্থির করল এখান থেকে পালিয়ে সে লণ্ডনে যাবে।

৩

যে চিন্তা সেই কাজ। পরদিন ভোরবেলা নিঃশব্দে বাড়ি ছেড়ে পথে নামল। তার একমাত্র সম্বল কিছু ছেঁড়া পোশাক আর একটা পেনি—যা সে একটা শ্রাদ্ধে পেয়েছিল। পথে পড়ল মিসেস ম্যানের বাড়ি। সেখানে ডিকের সঙ্গে তার দেখা হল, অনাথ-আশ্রমের এক পুরনো বন্ধু। তাকে দেখে অলিভারের খুব আনন্দ হল। তাকে জানাল তার ওপর খুব অত্যাচার হয়েছে। সে আর থাকতে পারছে না। তাই সে পালিয়ে যাচ্ছে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে একথা যেন কেউ না

চুরির দায়ে অলিভার ধরা পড়েছে

জানতে পারে। তারপর জিজ্ঞেস করল, তোমাকে এত রোগা দেখাচ্ছে কেন।

আমি এক কঠিন রোগে ভুগছি। ডাক্তার বলেন আমি নাকি মরতে চলেছি। তুমি যাও, পালিয়ে যাও—ক্ষীণকণ্ঠে বলল ডিক।

আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। তুমি ভাল হয়ে উঠবে।

বিদায় বন্ধু! ভগবান তোমার ভাল করবেন—ডিক প্রার্থনা জানাল।

এই প্রথম অলিভার শুনল কেউ তার জন্যে ভগবানের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে।

পথে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখল পাথরে লেখা আছে লণ্ডন—সত্তর মাইল। অলিভারের মন আনন্দে মেতে গেল লণ্ডন, কি বিরাট শহর। কেউ তাকে খুঁজে পাবে না, এমনকি বাম্বলও না। দিনে পথ চলে, রাত্রে কোন পরিত্যক্ত খামার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পথে দয়া করে কেউ সামান্য কিছু দেয়, তাই খেয়েই থাকে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা—গরম জামা কিছু নেই কাঁপতে কাঁপতে সে পথ চলে। এইভাবে বহুকষ্টে না খেয়ে সাতদিন এক-নাগাড়ে পথ চলে সে ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ল। পা দিয়ে তার রক্ত ঝরছে—সর্বাঙ্গ ধুলোয় ঢাকা। লণ্ডনের কাছে একটা ছোট শহরে এসে পৌছল। কোনরকমে একটা বাড়ির দোরগড়ায় এসে আর সে চলতে পারল না। সেখানেই সে পড়ে গেল। পথচারী লোকেরা একবার করে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে চলে যায়। কেউ তার সঙ্গে দুটো কথাও বলে না। বেশ কিছুক্ষণ পর অলিভার দেখল একটি ছোট ছেলে হাসতে হাসতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ছেলেটির গায়ে পা পর্যন্ত লম্বা একটা কোট। টুপিটা এমন ভাবে হেলিয়ে মাথায় বসানো দেখলেই মনে হয় এই পড়ে গেল বুঝি। তাকে দেখে মনে হল ভদ্রলোকের ছেলে। তার কথা-বার্তায় সদয়ভাব ফুটে উঠল। অলিভার তাকে জানাল সাতদিন তার খাওয়া হয়নি, কোন ছাদের নীচে শোয়নি। কথা বলতে বলতে তার চোখে জল এল। ছেলেটি তাকে সঙ্গে নিয়ে একটা সরাইখানায় গেল। সেখানে দুজনে পেট ভরে খেল। জন্মের পর বোধ হয় এই প্রথম অলিভার পেট ভর্তি খাবার পেল। তারপর ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, তুমি লণ্ডনে যাচ্ছ? সেখানে কোথায় থাকবে?

অলিভার উত্তর দিল—হ্যাঁ লণ্ডনে যাবো, থাকবার কোন জায়গা নেই। এমনকি সঙ্গে কোন টাকা-পয়সাও নেই।

ছেলেটি তার নাম জানাল জ্যাক ডকিন্স। রাতের অন্ধকার নেমে এলে সে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলল। এগলি সেগলি ঘুরে, অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে তারা একটা নোংরা ঘরে এসে ঢুকল। ঘরের মধ্যে একটা দড়িতে অনেকগুলো রুমাল ঝুলছে। একপাশে একটা টেবিল। তার একপাশে বসে আছে একটা বুড়ো—মাথার চুল লাল, জট-পড়া, মুখখানা শয়তানিতে মাখানো। টেবিলের আর একধারে চার-পাঁচটা ছেলে বসে আছে। ছেলেগুলি তাকে টানাটানি করে ভীষণ বিরক্ত করতে লাগল। ডকিন্স বুড়োর কানে ফিসফিস করে কিছু বলল। সে তখন হেসে অলিভারের দিকে হাত বাড়িয়ে অভিবাদন করল: তারপর বলল—তুমি ঐ রুমালগুলো দেখছ? ওগুলো কাচবার জন্যে ঠিক-করে রেখেছি—এই বলে হা-হা করে হেসে উঠল। তাদের খাওয়া হলে পর অলিভারকে মাটিতে একটা বিছানা করে শুতে বলল। অলিভার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

অদৃষ্ট অলিভারকে টেনে নিয়ে এল এক জঘন্য পরি-

বেশে। প্রথমে সে বুঝতেই পারেনি সেটা একটা পকেটমারদের আস্তানা। বুড়ো লোকটি হচ্ছে ফ্যাগিন—তাদের দলপতি।

পরের দিন একটু বেলায় অলিভারের ঘুম ভাঙল। সে চোখ মেলে দেখল ঘরে একা ফ্যাগিন বসে আছে। তার সামনে একটা বাক্স। তার ভেতর থেকে খানছয়েক হাতঘড়ি, কতকগুলো সুন্দর আংটি এবং আরো কতকগুলো চোখ ঝলসানো মণিমুক্তা বার করেছে। সেগুলো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে আর বিড়বিড় করে বলছে —মানুষদের ফাঁসিতে লটকানো কি মজার ব্যাপার! মৃত লোকেরা কখনো আফশোস করেনা। তারা কথাও বলতে পারেনা। কি সুন্দর আমাদের ব্যবসা! পাঁচজন ফাঁসিকাঠে ঝুলছে, তাদের মধ্যে আর একজনও নেই যে এসব মণিমুক্তার কথা বলবে!

হঠাৎ ফ্যাগিনের চোখ অলিভারের ওপর পড়ল। দেখল সে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। তাড়াতাড়ি বাক্সটা বন্ধ করে টেবিলের ওপর থেকে একটা পাউরুটি কাটা ছুরি নিয়ে অলিভারের দিকে এগিয়ে এল। এই যে তুমি উঠে পড়েছ? কি দেখেছ? বল, বল শীগগির বল! নয়ত তোমার জীবন যাবে!

আমার আর ঘুম হচ্ছে না—ভয়ে ভয়ে বলল অলিভার।

এসব জিনিসগুলো তুমি দেখেছ?

হ্যাঁ।

বাঃ! এগুলো সব আমার, বুঝলে। শেষ বয়সে আমার সম্বল। এই বলে ফ্যাগিন ছুরিটা রেখে দিল।

সেই সময়ে ডকিন্স চার্লি বেটস নামে আর একটা ছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

এই যে এস! আজ সকালে তোমরা নিশ্চয়ই কাজ করেছ? দেখি কি এনেছ?—ফ্যাগিন জিজ্ঞেস করল।

ডকিন্স ছুটো ব্যাগ ফ্যাগিনের হাতে দিল।

এগুলো ত' সেরকম ভারী বোধ হচ্ছে না। কিন্তু বেশ ভালই তৈরী। ওর হাতের কাজ বেশ ভাল, কি বল অলিভার?

হ্যাঁ বেশ ভালই—অলিভার উত্তর দিল। বেট্‌স তার কথা শুনে হাসল। কিন্তু অলিভার বুঝতে পারল না এ কথায় হাসির কি আছে?

তারপর ফ্যাগিন বেট্‌সকে জিজ্ঞেস করল—তুমি কি এনেছ?

চারটে রুমাল! ফ্যাগিন সেগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে

অলিভার ও ডকিন্স

দেখে বলল—বাঃ বেশ ভাল। কিন্তু এগুলোর দাগ এখনো তোলা হয়নি। আমরা অলিভারকে শিখিয়ে দেব কি করে করতে হবে, কি বল অলিভার—এই বলে সে হা-হা করে হেসে উঠল।

আপনার ইচ্ছা—অলিভার বলল।

ছেলেরা নানা জিনিস এনে বুড়োকে দিত। অলিভার ভাবত বুঝি তারা তৈরি করেছে। তারা মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে হাত সাফাই এর নানা রকম কসরৎ দেখাত। অলিভারের বেশ মজা লাগত। একবার বুড়ো ফ্যাগিন লাঠি হাতে করে, পকেটে নানা জিনিস ভরে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ডকিন্স ও বেট্‌স বুড়োর পেছনে খুব সন্তর্পণে ঘুরছে। মাঝে মাঝে বুড়ো থামছে—দরজার দিকে দাঁড়িয়ে একমনে কিছু দেখছে। এক সময় ডকিন্স তার পা দিয়ে বুড়োর একটা পায়ের ওপর চাপ দিল। বেট্‌সও সেই সময়ে পেছন দিয়ে তার গায়ের ওপর পড়ল। নিমেষ মধ্যে তারা দুজন বুড়োর পকেটের সব জিনিস সরিয়ে নিল। এই ভাবে অলিভারও আস্তে আস্তে হাতের কারসাজি শিখে নিল।

৪

দিনের পর দিন অন্ধকার ঘরে বসে বসে অলিভার হাঁপিয়ে উঠল। বাইরের উন্মুক্ত বাতাসে যাবার জন্যে তার মন ছটফট করতে লাগল। ফ্যাগিনকে জানাল সে বাইরে গিয়ে কাজ করতে চায়।

একদিন সকালবেলায় সে, ডকিন্স ও বেট্‌স—তিনজনে রাস্তায় বেরুল। হঠাৎ ডকিন্স দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখে আঙুল দিয়ে থামতে বলল।

কি ব্যাপার? অলিভার জিজ্ঞেস করল।

চুপ! ঐ বইয়ের দোকানের সামনে বুড়ো লোকটাকে দেখছ? ওকে দিয়েই কাজ হবে।

ঠিক বলেছ—বেট্‌স বলল।

অলিভার তাদের মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। কিছুই বুঝতে পারল না বুড়ো লোকটাকে দিয়ে তাদের কি কাজ হবে!

ছেলেটি আস্তে আস্তে বুড়ো লোকটির পেছনে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল। অলিভারও তাদের অনুসরণ করল।

বুড়ো লোকটির মাথা সাদা চুলে ভর্তি, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। একটা সবুজ রঙের কোট গায়ে, হাতে একটা লাঠি। লোকটি দোকান থেকে একটা বই নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়-

ফ্যাগিনের পকেট মারছে বেট্‌স ও ডকিন্স

ছিলেন। অলিভার আশ্চর্য হয়ে দেখল ডকিন্স লোকটার পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুমালটা তুলে নিল। সেটা বেট্‌সের হাতে দিয়ে দুজনে দৌড় লাগাল।

অলিভারের কাছে এখন সব ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভয়ে ও উত্তেজনায় সে হতভম্ব হয়ে গেছল। ঘোর কাটতেই সে দৌড়তে লাগল। ঠিক সেই সময় বুড়ো লোকটি পকেটে হাত দেয়, দেখে রুমাল নেই। পিছন ফিরে তাকিয়ে অলিভারকে ছুটে যেতে দেখে ভাবলেন ছেলেটাই চোর। 'চোর চোর' বলে চিৎকার করে বইটা হাতে নিয়েই তার পিছু ধাওয়া করলেন। রাস্তার লোকেরাও 'চোর, চোর—ধর, মার' বলে দৌড়ল। এমন কি ডকিন্স এবং বেট্‌সও চিৎকার শুনে তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

কিছুদূর দৌড়ে পেছন থেকে কোন কিছুর আঘাত লাগায় অলিভার মাটিতে পড়ে গেল। মুখ রক্তে ভরে গেল। লোকেরা সেখানে জড়ো হয়ে বুড়ো লোকটিকে জিজ্ঞেস করল—এই ছেলেটি কি আপনার পকেট মেরেছে?

বুড়ো লোকটি বললেন—আমার তাই মনে হয়। আহা বেচারা! খুব আঘাত পেয়েছে।

ইতিমধ্যে পুলিস এসে তাকে টানতে টানতে আদালতের দিকে নিয়ে চলল। অলিভার অতিকষ্টে প্রতিবাদ করে বলল—আমি চোর নই, অন্য দুজন ছেলে। তারা এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। তার কথা বিশ্বাস না করে তাকে নিয়ে বিচারকের সামনে পুলিস হাজির করল। এদিকে তখন বেলা হয়ে গেছে। বিচারক খেতে যাবার জন্য তাড়া করছেন। এমন সময় সেখানে অলিভারকে দেখে খুব বিরক্ত হলেন। পুলিসকে জিজ্ঞেস করলেন—এর বিরুদ্ধে মামলা তৈরী আছে। পুলিস জানাল না। হঠাৎ সেখানে দৌড়তে দৌড়তে কালো স্যুট পরা একজন লোক এসে বললেন—হুজুর, বালকটি নিরপরাধ, ওকে শাস্তি দেবেন না। বিচারক জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে?

লোকটি বললেন—আমি ঐ দোকানের মালিক। আমি সমস্ত ঘটনা দেখেছি। এই ছেলেটির সঙ্গে আরো দুজন ছিল। তাদের মধ্যে একজন এই বুড়ো ভদ্রলোকটির পকেট থেকে রুমাল তুলে নেয়। এই ছেলেটি কিছুই করেনি। দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিল।

বিচারক অলিভারকে মুক্তি দিলেন। দোকান-মালিকের দয়ায় সে যাত্রা অলিভার তিন মাস জেলখাটার হাত থেকে রক্ষা পেল। অলিভার

ব্রাউনলোর বাড়িতে অলিভার-ফোটের সঙ্গে মুখের আশ্চর্য মিল

ততক্ষণে আদালতের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সেই বুড়ো লোকটি তার কাছে এসে বললেন, আহা, বেচারার খুব লেগেছে। কেউ দয়া করে একটা গাড়ি ডেকে দিন। গাড়ি এলে অলিভারকে নিয়ে লোকটি তার বাড়িতে গেলেন। লোকটির নাম ব্রাউনলো।

ছেলেদুটি ফ্যাগিনকে গিয়ে খবর দিল অলিভার পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে। ফ্যাগিন ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। ভাবল অলিভার হয়ত তার আস্তানা ও দলের কাণ্ড কারখানা সব ফাঁস করে দেবে। আর সেখানে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে আস্তানা গুটিয়ে ফেলতে চাইল। সেই সময়ে বিল সাইক্স নামে আর একটা বদমাশ লোক সেখানে এল। বিল সমস্ত ঘটনা শুনল। তারা সকলেই গভীর-ভাবে চিন্তা করতে লাগল। বেট ও ন্যানসি নামে দলের দুটি মেয়েও সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল। তাদের দেখে ফ্যাগিনের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সেই ন্যানসির ওপর ভার দিল যেভাবে হোক অলিভারের খোঁজ করতে হবে। তাকে যেকোন প্রকারে ধরে আনতেই হবে।

৫

ব্রাউনলো অলিভারকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকা মিসেস বেডউইনকে ডেকে সব ঘটনা বলে তার ওপর অলিভারের দেখাশুনার ভার দিলেন। বেশ কয়েকদিন অসুস্থ হয়ে থাকার পর তাদের আদর যত্নে অলিভার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। শরীরে শক্তিও ফিরে এল। এই শান্ত উদ্বেগহীন নতুন জীবন অলিভারের অতীতের সমস্ত দুঃস্বপ্নকে মিলিয়ে দিতে লাগল।

একদিন রাত্রে অলিভার মিসেস বেডউইনের ঘরে আছে। তার নজর পড়ল দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির উপর। ছবিতে মেয়েটির চোখ দুটি যেন দুঃখে ভরা--তার দিকে তাকিয়ে যেন কিছু বলতে চাইছে। এই সময়ে ব্রাউনলো ঘরে ঢুকলেন। তিনিও ছবিটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। বেডউইনকে বললেন—দেখেছ, কি আশ্চর্য মিল! অলিভারের চোখ, মুখ, মাথা-মুখের গড়ন-সব ছবির সঙ্গে হুবহু মিল।

কিন্তু অলিভারের ভাগ্যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বেশিদিন সইল না। আবার সে পকেটমারদের খপ্পরে গিয়ে পড়ল। একদিন ব্রাউনলো অলিভারের কাছ থেকে তার অতীত জীবনের কাহিনী শুনছিলেন। তখন তাঁর এক বন্ধু, গ্রিমউইগ সেখানে এলেন। অলিভারকে দেখিয়ে ব্রাউনলো বললেন—এই হচ্ছে অলিভার টুইস্ট যার কথা তোমাকে বলেছি। অলিভার মাথা নিচু করে গ্রিমউইগকে অভিবাদন করল। তার সম্বন্ধে আরো কথা জানতে চাইলে ব্রাউনলো জানালেন পরের দিন ওর ব্যাপারে কথা হবে। গ্রিমউইগ প্রথম থেকেই অলিভারকে ভালো চোখে দেখেন নি। তাই তিনি ব্রাউনলোকে বললেন—ছেলেটি আর কাল আসবে না। তুমি লোকদের বড্ড বেশি বিশ্বাস কর। আমি বলছি ছেলেটা তোমাকে ঠকাচ্ছে। তা যদি না হয়, আমার মাথা চিবিয়ে খাব। ব্রাউনলো তাঁর কথা কিছুতেই স্বীকার করলেন না।

ঠিক সেই মুহূর্তে বেডউইন কতকগুলি বই নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বললেন—এই বইগুলি আজই দোকানে ফেরত দিতে হবে। আপনি নিজেই নিয়ে যান। গ্রিমউইগ দেখলেন এই সুযোগে তাঁর কথার সত্যতা পরীক্ষা করা যাবে। তাই তিনি বললেন—আরে অলিভারকে পাঠিয়ে দাও। তুমিত' তাকে বিশ্বাস কর।

অলিভার সে কথা শুনে বলল—আমাকে বইগুলো

দিন। আমি এখুনি ফিরিয়ে দিয়ে আসছি।

ব্রাউনলো অলিভারকে বাড়ির বাইরে পাঠাতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু গ্রিমউইগের মিথ্যা ধারণা তার বিশ্বস্ততার দ্বারা প্রমাণিত করার জন্যেই তিনি অলিভারকে পাঠাবার মনঃস্থ করলেন।

ঠিক আছে অলিভার তুমি যাও। বইগুলো দোকানে ফেরত দিয়ে এস। আর এই পাঁচ পাউণ্ডের নোটটা নাও। দোকানীকে বই এর জন্যে চার পাউণ্ড দশ শিলিং দেবে। বাকি দশ শিলিং ফিরিয়ে আনবে।

আমার বেশি দেরি হবে না—এই বলে অলিভার নোটটা পকেটে রেখে, বইগুলো হাতে নিয়ে, অভিবাদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৬

ন্যানসি ব্রাউনলোর বাড়ির আশেপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে সুযোগ খুঁজছিল যদি একবার অলিভার বাইরে বেরোয় তাহলে তাকে ধরে নিয়ে যাবে। সে সুযোগ তার এল। অলিভার বাড়ি থেকে বেরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে দোকানে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাকে পেছনে থেকে দুহাত দিয়ে কে জাপটে ধরল। ছেড়ে দাও আমাকে। কে তুমি? কেন আমাকে আটকাচ্ছ? চিৎকার করে বলে উঠল অলিভার। আমি পেয়েছি! ও অলিভার, অলিভার, ভাই আমার! তুই কোথায় পালিয়েছিলি? বাবা-মা তোর জন্যে ভেবে অস্থির? বাড়ি থেকে পালিয়ে চোরেদের সঙ্গে মিশেছিস আর মার মনে দুঃখ দিয়েছিস—এই বলে কাঁদতে আরম্ভ করল। লোকেরা সেখানে জড় হল। তারা অলিভারকে লক্ষ্য করে নানা খারাপ কথা বলতে লাগল।

আমি খারাপ নই। আমি একে চিনি না। আমার কোন বোন নেই, বাবাও নেই।

ন্যানসি তখন পিছন দিক থেকে তার পাশে মুখ নিয়ে গেল।

কে ন্যানসি! —অলিভার আশ্চর্য হয়ে গেল।

দেখলেন, ও আমাকে চেনে! ভিড়ের দিকে চেয়ে ন্যানসি বলল। আপনারা আমাকে একটু সাহায্য করুন, ওর মা-বাবার কাছে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

বিল সাইক্সও তাকে সাহায্য করবার জন্যে একপাশে কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বলল—এই বদমাস, বাড়ি চল এখুনি।

আমি ওদের কেউ নই। আমি ওদের চিনি না! দয়া করে আমাকে বাঁচান—করুণ স্বরে মিনতি

ফ্যাগিনের কবলে অলিভার, ন্যানসি লাঠি কেড়ে নিয়েছে

করল অলিভার।

বাঁচাবে! আমিই তোমাকে বাঁচাচ্ছি। এই বইগুলো কোথায় পেলি? আবার চুরি করেছিস? —বইগুলো হাত থেকে নিয়ে বিল তার মাথায় সজোরে আঘাত করল।

পথচারী লোকেরা কেউ তার কথা বিশ্বাস করল না। তারা দুজনে অলিভারকে নিয়ে তাদের আড্ডায় গেল। এদিকে ব্রাউনলো ও বেডউইন সারাক্ষণ ধরে অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে একবার বাইরে যায় আর ভেতরে আসে। চাকরেরা রাস্তায় অনেক খোঁজাখুঁজি করল কোথাও অলিভারকে পাওয়া গেল না।

অলিভারকে দেখে চার্লি ঠাট্টা করে বলে উঠল—এই যে এসে গেছে। ফ্যাগিন দেখ, দেখ—ওর পোশাক দেখ। হাতে আবার বই। ওঃ, একেবারে ফিটফাট ভদ্রলোক! আমি আর হাসি বন্ধ করতে পারছিনা! শীগগির কেউ আমাকে ধর।

ফ্যাগিনও কৌতুক করে বলল, তোমায় দেখে খুব খুশী হয়েছি। আর তোমাকে বেশ ভাল দেখাচ্ছে। চার্লি তোমাকে আর একটা পোশাক দিচ্ছে, ওটা খুলে রেখে দাও, নষ্ট হয় না যেন। তুমি আসছ আগে জানাতে হয়, তাহলে তোমার জন্যে বেশ গরম গরম খাবার তৈরি করে রাখতুম।

চার্লি অলিভারের পকেট থেকে পাঁচ পাউণ্ডের নোটটা বার করে নিল। সেটা দেখেই বিল কেড়ে নিয়ে বলল, এটা আমার। ফ্যাগিন জানাল, নোটটা আমার, বইগুলো তোমার। এইভাবে যখন নোট আর বই নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল তখন ফ্যাগিনের পায়ে ধরে অলিভার বলল, ওগুলো সেই দয়ালু বুড়ো ভদ্রলোকের। তিনিই আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে তোলেন। দয়া করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি এবং বৃদ্ধা মহিলাটি ভাববেন আমি হয়ত চুরি করেছি!

ঠিক ঠিক তারা ভাববে তুমি চুরি করেছ। এই বলে ফ্যাগিন হো হো করে হেসে উঠল। সেই ফাঁকে অলিভার তাদের আস্তানা থেকে পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাকে ছেলেরা ধরে আনল। ফ্যাগিন তাকে ধরে রাগের বশে তার পিঠে এক ঘা লাঠি মারল। অলিভার যন্ত্রণায় চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আবার এক ঘা লাঠি যেই মারতে যাবে ন্যানসি তখন আর স্থির থাকতে পারল না। নারী-সুলভ স্বাভাবিক দয়া মায়া তার হৃদয়ে ছিল। গো-বেচারা, নির্দোষ অলিভারের ওপর এরকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করে উঠল। ছুটে গিয়ে ফ্যাগিনের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেল দিল। তারপর বলল, তুমি ত ছেলেকে পেয়েছ? আরো বেশি কি আশা কর? বিল তাকে চুপ করে থাকত বলল। ন্যানসির কথায় কেউ কোন গুরুত্ব দিল না। অলিভারকে একটা অন্ধকার-ঘরে সাতদিন আটকে রাখা হল।

৭

বাম্বল একদিন খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। তাতে লেখা আছে—অলিভার টুইস্ট হারিয়ে গেছে। যে তার সন্ধান দিতে পারবে তাকে পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। অলিভারের চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা দেওয়া আছে। তলায় ব্রাউনলোর নাম ও ঠিকানা।

বম্বল সেই নাম ঠিকানায় ব্রাউনলোর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি অলিভারের নামে অনেক বাজে

ও মিথ্যা কথা বললেন। তিনি চলে গেলে পর ব্রাউনলো বেডউইনকে ডেকে বললেন—আমার মনে হচ্ছে অলিভার খুব খারাপ ছেলে। বেডউইন তাঁকে দৃঢ়স্বরে জানালেন, আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। ব্রাউনলো বিরক্ত স্বরে বলে উঠলেন, চুপ করো! তার নাম আমার কাছে আর উচ্চারণ করবে না।

এদিকে ফ্যাগিন অলিভারকে অকৃতজ্ঞতার পরিণাম সম্বন্ধে নানা ভীতিজনক গল্প শোনাতে লাগল। যেসব ছেলেরা তার কাছ থেকে পালিয়ে গেছল কিভাবে তাদের ফাঁসিতে লটকান হয়েছিল তার বিভীষিকাময় বর্ণনা দিতে লাগল। তাকে বলল তার নিরাশ্রয় অবস্থায় সে-ই তাকে রক্ষা করেছে। বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম ফাঁসি। ফ্যাগিনের শাসানি শুনে অলিভারের গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল।

তারপর একসময়ে ফ্যাগিন ও সাইক্স চার্টসি গ্রামের একটা বাড়িতে চুরি করার মতলব করল। ঠিক হল অলিভারকে একটা ছোট জানালা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে! সে ভেতর থেকে সদর দরজা খুলে দেবে। তখন তারা অনায়াসে চুরি করতে পারবে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে অলিভার দেখল তার বিছানার কাছে নতুন একজোড়া জুতো রয়েছে। তাই দেখে তার মন আনন্দে নেচে উঠল। ভাবল নতুন জুতো পরে সে বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু তার সে আশা পরমুহূর্তেই ঘুচে গেল। ফ্যাগিন এসে জানাল ন্যানসি তাকে রাত্রে বিলের কাছে নিয়ে যাবে। কোনরকম বেয়াড়াপনা করবে না। বিলের অবাধ্য হবে না। যা বলবে সেইমত কাজ করবে। রেগে গেলে সে খুন করে দিতেও পারে। অলিভারের মন এক অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল। সেদিন রাতে ন্যানসি তাকে বিলের কাছে নিয়ে গেল। তাকে ভাল কথায় বোঝাল সে যদি কোন দুষ্টুমি না করে তাহলে তারও কোন ক্ষতি হবে না।

অমাবস্যার এক গভীর রাতে অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে বিল সাইক্স ও টবি ক্র্যাকিট উঁচু পাঁচিল ঘেরা একটা বাড়ির সামনে হাজির হল। তখন বৃষ্টি পড়ছে। জোরে বাতাসও বইছে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা। টবি তাড়াতাড়ি পাঁচিলে উঠে চাপা গলায় অলিভারকে ওপরে তুলে দিতে বলল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল তারা তিনজনেই পাঁচিলটা টপকে ওপাশে ঘাসের ওপর নিঃশব্দে পড়ে আছে। এতক্ষণে অলিভার বুঝতে পারল তারা বাড়িতে

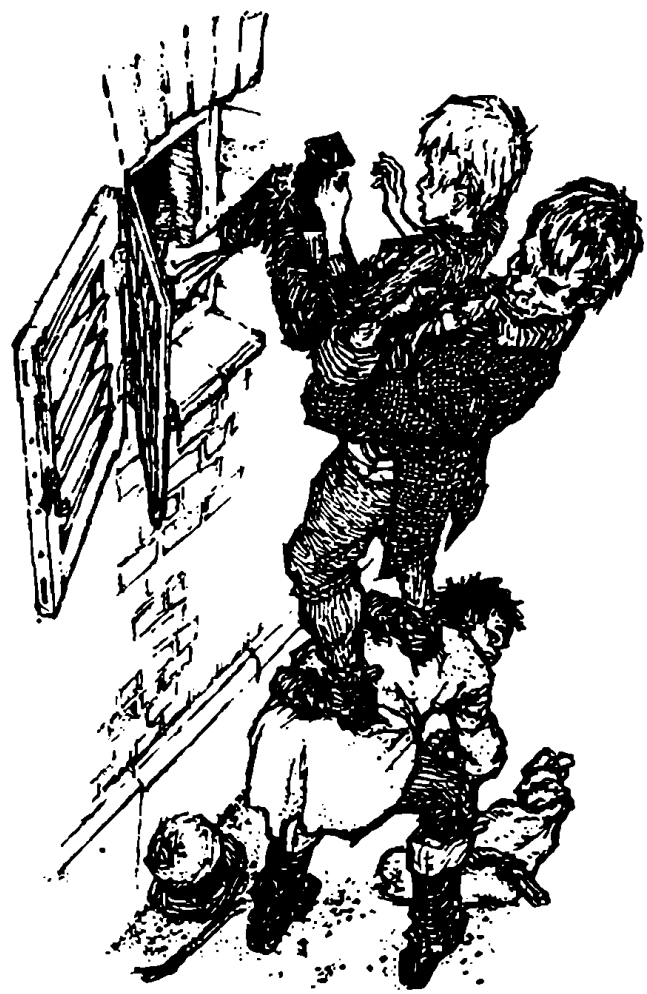

সাইকস জানালা দিয়ে অলিভারকে ভেতরে দিচ্ছে

চুরি করতে এসেছে, হয়ত তারা খুনও করবে। সে কেঁদে উঠে মিনতি করে বলল, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে চুরি করতে ব'লনা। আমি আর কখনও লণ্ডনে আসব না। কখনও না! ভয়ে-ভাবনায় সে শিউরে উঠল। তার কপালে পিস্তল রেখে বিল তাকে চুপ করে থাকতে বলল—কোনরকম আওয়াজ করলেই মৃত্যু! ক্র্যাকিটের পিঠের ওপর বিল দাঁড়িয়ে অলিভারকে জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। হাতে তার একটা আলো। অলিভার ভাবল বাড়ির লোককে জাগিয়ে দিই। তাতে যদি আমার মৃত্যু হয় সেও ভাল। বাড়ির কোন অনিষ্ট করতে দেব না। ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়ির ওপর দুজন লোককে দেখা গেল। বিল অলিভারকে পালিয়ে আসতে বলল। ভেতর থেকে একটা চাপা গোলমাল শোনা গেল। হঠাৎ গুলির শব্দ! অলিভার পড়ে গেল। বিল তাকে জানালা দিয়ে টেনে বাইরে নিয়ে এল। অলিভারের একটা জামার হাতা রক্তে ভেজা। সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। বিল ও টবি দুজনে তাকে ধরে নিয়ে পালাতে লাগল। পেছনে অনেক লোকের আওয়াজ পাওয়া গেল। বোঝা গেল তাদের ধাওয়া করেছে। নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে তারা অলিভারকে ফাঁকা মাঠে একটা খানার মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। রাতের শেষে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হ'ল। কিন্তু বৃষ্টির ধারা অলিভারের অনুভবশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারল না।

৮.

পরদিন ভোরে তার জ্ঞান ফিরে এল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে অস্ফুট আর্তনাদ করছে। তখনও বৃষ্টি হচ্ছে—ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। জলে ভিজে থরথর করে সে কাঁপছে। বেশিক্ষণ এভাবে পড়ে থাকলে তার মৃত্যু অবধারিত। সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াবার কোন শক্তিই তার নেই। অতি কষ্টে দুপায়ে ভর দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। একটু দূরে একটা বাড়ি দেখতে পেল। কোনরকমে টলতে টলতে সেই বাড়িটার দরজার কাছে গিয়ে আর দাঁড়াতে পারল না। দরজার ওপরে পড়ে যেতে দরজায় একটা আওয়াজ হল।

বাড়ির খাস ভৃত্য গাইল্‌স দরজা খুলে আশ্চর্য হয়ে দেখল একটি ছোট ছেলে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে। তাকে তুলে নিয়ে ভেতরে এল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে চিৎকার করে বলতে লাগল—দিদিমণি, একটা চোরকে ধরেছি। এটাকেই আমি গুলি করেছিলুম।

সিঁড়ির মাথা থেকে এক যুবতী বলল। আস্তে গাইল্‌স! বেশি চিৎকার করোনা। পিসিমা ভয় পাবেন। লোকটি কি আহত?

হ্যাঁ, খুব আহত—গাইল্‌স উত্তর দিল।

ঠিক আছে। তোমরা এখানে চুপ করে অপেক্ষা কর। আমি পিসিমাকে জিজ্ঞেস করে আসি কি করা হবে। যুবতীর নাম মিস রোজ মেইলি। আর পিসিমা হচ্ছেন মিসেস মেইলি। একটু পরেই ফিরে এসে বলল, চোরটাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। আর ব্রিট্‌ল ঘোড়ায় চ'ড়ে শহরে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসুক।

চোর ধরে গাইল্‌সের খুব আনন্দ। সে রোজকে অনুরোধ করল, একবার আসুন, চোরকে দেখে যান।

এখন নয়, এখন নয়! আহা বেচারা! ওকে যত্ন করো—বলল রোজ।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পর ব্রিট্‌ল্‌ ডাক্তার নিয়ে এল। রাস্তায় সে সব ঘটনা ডাক্তারকে জানায়। ডাক্তার এসে গাইল্‌সের ঘরে ঢুকলেন। সেখানে অলিভারকে একটা বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছিল। অনেকক্ষণ পর ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর সোজা গেলেন মিসেস মেইলি ও রোজ যে ঘরে বসেছিলেন সেখানে। তাঁদের জানালেন চোরটির এখন অবস্থা ভাল। আপনারা যদি দেখতে ইচ্ছে করেন ত' ঘরে যেতে পারেন।

পিসিমার সঙ্গে রোজ ঘরে ঢুকলেন। ভেবেছিলেন এক ভীষণ কুৎসিত দুষ্ট প্রকৃতির লোক দেখবেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলেন এক ফুটফুটে সুন্দর ছোট্ট ছেলে বিছানায় শুয়ে আছে। তার বাঁহাত বুকের ওপরে। মাথাটা অন্য হাতে। লম্বা চুলগুলো মুখের ওপর এসে পড়েছে। গভীর ঘুমে সে আচ্ছন্ন। রোজ স্নেহভরে চুলগুলো তার কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিল। তার চোখে জল এসে গেল! এত বাচ্চা এমন হীন কাজে জড়িয়ে পড়েছে! যে এখনো মায়ের স্নেহ-ভালবাসা ভাল করে পাইনি! পিসিমা, তুমি ওকে ক্ষমা কর। ওকে পুলিসে ধরিয়ে দিও না। আর্তকণ্ঠে রোজ বললেন। তুমি কিছু ভেব না। আমি ওর কোন ক্ষতি হতে দেব না—পিসিমা তাকে আশ্বাস দিলেন।

এঁদের দুজনের দয়ায় ও তত্ত্বাবধানে সে যাত্রা অলিভার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এল। হতভাগ্য বালক জানাল তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা। কায়মন-প্রাণে তাঁদের সেবা করার জন্যে সে উৎসুক হয়ে উঠল।

মহিলারা তার ওপর সদয় ব্যবহার করতে লাগলেন। শরীর সারাবার জন্যে তাকে নিয়ে তাঁরা দেশের বাড়িতে গেলেন। সেখানে বেশ আনন্দে ও সুখে তার দিন কাটতে লাগল। তাঁদের বাগান দেখাশুনা করা, ঘরের নানা কাজ করা ছাড়া কিছু লেখাপড়াও করতে আরম্ভ করল। সন্ধ্যেবেলায় রোজ পিয়ানো বাজিয়ে গান করতেন আর অলিভার তন্ময় হয়ে শুনত। তখনও ব্রাউনলো ও বেডউইনের দয়ালুতা ও স্নেহ-ভালবাসার কথা অলিভারের মনে মাঝে মাঝে উঁকি দিত। এই ভাবে তিন মাস তার শান্তি স্বস্তির মধ্যে দিয়ে কেটে গেল।

৯

হঠাৎ একদিন রোজ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অলিভারকে পাঠান হল সরাইখানায়, সেখান

মেইলিদের বাড়িতে অলিভার

থেকে ডাক্তারকে খবর দেবার জন্যে। উদ্বিগ্ন মনে ও চঞ্চল হৃদয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসার সময় কালো কোট পরা এক লম্বা লোকের সঙ্গে অলিভারের ধাক্কা লাগল। লোকটির সঙ্গে তার কিছু কথা হল। তারপরেই লোকটি হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অলিভার বাড়িতে ফিরে এল। হায়! অলিভার যদি জানত লোকটি কে আর তার ভাগ্য আবার তাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে তাহলে হয়ত তাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। লোকটি নাম মঙ্কস।

বেশ কয়েকদিন ধরে যমে-মানুষে যুদ্ধ করে অবশেষে রোজ সুস্থ হয়ে উঠলেন। খুশির আনন্দে অলিভার কি বলবে, কি করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। দৌড়ে বাগানে গিয়ে সে এক গোছা ফুল এনে রোজের ঘরে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখল।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় পড়তে পড়তে অলিভারের ঝিমুনি এল। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল। হঠাৎ জানালার দিকে তার চোখ পড়ল। দেখে ফ্যাগিন আর সেই লম্বা লোকটি দাঁড়িয়ে আছে! অলিভার নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারল না। বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে এলে ভয়ে শিউরে উঠে চিৎকার করে উঠল। লোকেরা ছুটে এলে সে লোক দুটি সম্বন্ধে তাদের জানাল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের কোথাও পাওয়া গেল না।

১০

বাম্বলের কাছে একদিন মঙ্কস হাজির। সে বলল আমি তোমাকে চিনি। এই অনাথ আশ্রমে বার বছর আগে একটি ছেলে জন্মায়। তাকে একটা কফিন তৈরির কারখানায় কাজ করতে পাঠান হয়। তারপর সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুমি অলিভার টুইস্টের কথা বলছ?

আমি তাঁর সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই না। যে বৃদ্ধা মহিলাটি তাকে দেখাশুনা করত আমি তার সম্বন্ধে জানতে চাই। সে এখন কোথায় আছে? মঙ্কস জিজ্ঞেস করল।

কোথায় সে আছে? ওঃ, সে ত' গত বছর মারা গেছে—বাম্বল উত্তর দিলেন। কিন্তু তার এক বন্ধু এখনও বেঁচে আছে।

কি করে তার সঙ্গে দেখা হতে পারে?

আমিই তাকে দেখা করাতে পারি।

ঠিক আছে। আগামীকাল রাত নটার সময় এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে তাকে গোপনে দেখা করতে বলবে। মঙ্কস তার হাতে একটা ঠিকানা লিখে দিল। বললে আমার নাম মঙ্কস।

পরদিন বাম্বল সেই মহিলাটিকে নিয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙা বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করলেন। মহিলাটি মঙ্কসকে জানাল যে তার বন্ধু মারা যাবার আগে একটা ছোট থলি তাকে দিয়ে যায়। বলে যায় থলিটা অলিভার টুইস্ট নামে একটি বালকের মায়ের শেষ সম্বল। সেই থলিটা লোকটিকে দিল। সে থলিটা খুলে দেখল তার মধ্যে রয়েছে দুটি স্বর্ণালঙ্কার, দুটি চুলের গুছি আর 'অ্যাগনেস' নামাঙ্কিত একটি সোনার আংটি।

এতক্ষণ বাম্বল চুপ করে তাদের কথা শুনছিলেন। এবার তিনি মঙ্কসকে বললেন—আমি কি দুটো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি?

হ্যাঁ, তুমি পার, তবে উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ওপর নির্ভর করছে।

প্রথম প্রশ্ন: তুমি কি এগুলো পাবার আশা করেছিলে?

হ্যাঁ। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ?
এগুলো নিয়ে তুমি করবে ? আমার বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে ?
না, এগুলো নিয়ে কি করা যায় দেখবে এস।
সেই সময়ে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, জোরে হাওয়া বইছে। পাশেই নদী খরস্রোতা। শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে মঙ্কস থলিটা সেই নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। জানা গেল অলিভারের মায়ের নাম ছিল অ্যাগনেস।
তারপর মঙ্কস একদিন ফ্যাগিনের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ন্যানসিও তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। ফ্যাগিনের সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনে ন্যানসি বুঝতে পারল অলিভারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার এক ঘৃণ্য চক্রান্ত হচ্ছে।
ন্যানসি যতই হীন, যতই নীচ হোক না কেন, তার অন্তরে স্নেহ-ভালবাসা ছিল। সে একবার অলিভারকে ভাই বলে সম্বোধন করেছিল। এই নিরপরাধ, সরল বালকটির প্রতি কোন অত্যাচারই সে সহ্য করতে পারত না। তাই যেদিন অলিভারের বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারল, সে আর স্থির থাকতে পারল না। অলিভারকে এই সব নৃশংস লোকেদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সে মনে মনে সংকল্প করল।
সে শুনেছিল মিসেস মেইলি ও তাঁর ভাইঝি রোজ হাইড পার্কের কাছেই একটা হোটেলে রয়েছেন। গোপনে সেখানে গিয়ে রোজের সঙ্গে সে দেখা করে তাকে জানাল যেদিন অলিভার ব্রাউনলোর বাড়ি থেকে বেরোয় সেদিন সেই তাকে ফ্যাগিনের কাছে ধরে নিয়ে যায়। অলিভার যে এখানে আছে ফ্যাগিন তা জানতে পেরেছে। মঙ্কসকে কি আপনি চেনেন ? তারা দুজনে তাকে চুরি করে নিয়ে যাবার মতলব করেছে। সে তার যাতে পৃথিবীর আলো দেখতে না পায় সে রকম ফন্দিও করা হচ্ছে। মঙ্কস বলেছে তার ছোটভাই অলিভারের জীবনলীলা শেষ করতেই হবে। তার আসল পরিচয় নদীর গর্ভে আছে। আমার একান্ত অনুরোধ এই দুধের বাছাটিকে আপনি যেভাবে পারেন বাঁচান। আপনি হয়ত ভাবছেন একটা নোংরা মেয়ের কথার কি দাম আছে। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে আমি ভায়ের মত দেখেছি। তার ওপর কোন আঘাত হলে আমারও বুকে লাগবে। আমার হাত-পা বাঁধা, আমার দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়। অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই।

ন নদীতে থলি ফেলে দিচ্ছে

না, আর একটু থাক বোন। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। তুমি এখানে নির্ভয়ে থাকতে পার তোমার কোন অনিষ্ট হবে না, রোজ তাকে ভরসা দিয়ে বলল।

না, তা হয় না। যেতে আমাকে হবেই।

যদি দরকার হয়, কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারব?

যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে প্রতি রবিবার রাত এগারটা থেকে বারটা পর্যন্ত লণ্ডন ব্রীজের কাছে থাকব। এটা কিন্তু খুব গোপনে রাখবেন। আপনি অথবা উপকারী লোকছাড়া এ-কথা যেন আর কেউ জানতে না পারে। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আমি যাই।

ন্যানসির কথা শুনে রোজ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই দুঃসময়ে কে তাকে সাহায্য করতে পারে? হঠাৎ ব্রাউনলোর কথা তাঁর মনে এল। অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ব্রাউনলোর বাড়ি গেলেন। গাড়িতে অলিভারকে বসিয়ে তিনি একাই ব্রাউনলোর সঙ্গে দেখা করলেন। সেখানে তখন গ্রিমউইগও বসেছিলেন।

আমার এক ছোট্ট বন্ধুকে আপনি এক সময় খুব আদর যত্ন করেছিলেন। আমি নিশ্চিত যে আপনি তার সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হবেন। তার নাম অলিভার টুইস্ট। রোজ ব্রাউনলোকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

তাই নাকি! ব্রাউনলো ও গ্রিমউইগ দুজনেই খুব আশ্চর্য হলেন।

আমি তার সম্বন্ধে খারপ ধারণা করেছিলাম—ব্রাউনলো বললেন।

অত্যন্ত খারাপ ছেলে! তা যদি না হয়, আমি আমার মাথা চিবিয়ে খাব—গ্রিমউইগ বলে উঠলেন।

না। সে ভাল ছেলে। তার স্বভাব চরিত্রও ভাল—তাড়াতাড়ি উত্তর দিন রোজ। আমি তাকে নীচে গাড়িতে বসিয়ে রেখেছি। এই বলে রোজ সমস্ত ঘটনা বললেন

অলিভারের সুসংবাদ শুনে ব্রাউনলো খুব আনন্দিত হলেন। তিনি নিজে গিয়ে অলিভারকে নিয়ে এলেন। মিসেস বেডউইনও অলিভারকে দেখে গভীর স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁরা সকলেই ভগবানকে ধন্যবাদ জানালেন। ব্রাউনলো রোজকে অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন। রোজ ন্যানসির কাছ থেকে শোনা সমস্ত কথা তাঁকে জানালেন।

তাঁরা দুজনে গোপনে ন্যানসীর সঙ্গে দেখা করলেন। ফ্যাগিন ও বিল সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে

রোজের কাছে ন্যানসি

পারলেন। তারপর : সের বিষয় তাকে জিজ্ঞেস করলেন। ন্যানসি ল—লোকটি ঢ্যাঙা, রং কালো, চোখ দিয়ে ত :সার আগুন বেরোচ্ছে। বয়েস প্রায় আটাশ। যখন সে হাঁটে তখন মাথাটাকে একবার ডা দিক আর একবার বাঁ দিকে ঘোরায়। সে এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। মাঝে মাঝে নিজের হাত কামড়ায়! কি হল আপনার মিঃ ব্রাউনলো?

না, না—কিছু না। বলে যাও—।

কালো রঙের পোশাক সে সব সময় পরে। তার গলায় একটা—।

একটা পোড়া দাগ—বলে উঠলেন ব্রাউনলো।

কি ব্যাপার? আপনি তাকে চেনেন? আশ্চর্য হয়ে ন্যানসি জিজ্ঞেস করল।

আমার মনে হচ্ছে। হয়ত সে নাও হতে পারে—। ব্রাউনলো কিছুক্ষণ চিন্তা করে অস্ফুট স্বরে বললেন —নিশ্চয়ই সে!

এদিকে চার্লি বেট্‌স ন্যানসিকে অনুসরণ করে সমস্ত ব্যাপার ফ্যাগিনকে জানাল। তার বিশ্বাঘাতকতায় ফ্যাগিন ভীষণ রেগে উঠল। সেই সঙ্গে আবার তার মনে ভয়ও দানা বাঁধল। বিল সেই সময় সেখানে এলে তাকে জানান হল। সে কথা শুনে বিল উত্তেজিত হয়ে তার নিজের ঘরে গেল। তখন ন্যানসি ঘুমোচ্ছিল। তাকে দেখে বিল বন্য-জন্তুর মত হিংসার আগুনে জ্বলে উঠল। চুলের মুঠি ধরে তাকে তুলে পিটিয়ে মেরে ফেলল। ন্যানসি তার কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করল কিন্তু সবই বৃথা হল।

১২

ন্যানসিকে হত্যা করে বিল তার কুকুরকে নিয়ে পালিয়ে গেল। লণ্ডন ছেড়ে সে ক্রমশ উত্তর দিকে হাঁটতে লাগল। বহু দূর চলার পর একদিন সন্ধ্যেবেলায় সে একটা সরাইখানায় এসে পৌঁছল। সেখানে একজন ফেরিওয়ালা একরকম পাউডার বিক্রি করছিল। পাউডারের এমন গুণ যে জামা কাপড়ের যে কোন দাগ তুলে দিতে পারে। বিলের মাথার টুপিটায় তখনও রক্তের দাগ লেগেছিল। পাউডারের গুণ পরীক্ষা করার জন্যে লোকটি বিলের টুপিটা খুলে নিল। বিল ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে টুপিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে সেখান থেকে সবেগে পালিয়ে গেল। রাস্তায় যেতে যেতে শুনতে পেল লোকেরা ন্যানসির হত্যা নিয়ে আলোচনা করছে। এতে সে আরও ভীত হয়ে পড়ল।

বিল লণ্ডনে ফিরে এসেছে

বিল ভাবল এভাবে সে আর চলতে পারবে না, লণ্ডনে ফিরে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। সেখানে ফ্যাগিনের সাহায্যে সে ফ্রান্সে পালিয়ে যাবে।

১৩

একদিন সন্ধ্যোবেলা ব্রাউনলো মঙ্কসকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তাকে জানালেন তার বাবার সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল। তিনি মঙ্কসকে তার বাবার জীবনের সব ইতিহাস বললেন। আরও জানালেন তোমার আসল নাম এডওয়ার্ড লী ফোর্ড। অলিভার তোমার সৎ-ভাই। তুমি তাকে মেরে ফেলবার চেষ্টাও করেছ কিন্তু সফল হওনি। ফ্যাগিনকে তুমি বলেছ অলিভারের প্রকৃত পরিচয় নদীগর্ভে নিহিত। যে টাকা পয়সা তোমার বাবা রেখে গেছেন তার অর্ধেক অলিভারকে দিতে হবে। তুমি যদি তা' দিতে স্বীকার কর তাহলে আমাকে পুলিসের সাহায্য নিতে হবে না। মঙ্কস প্রথমে রাজি না হলেও পরে দিতে বাধ্য হয়। গ্রিমউইগও সেই সময়ে বাম্বলকে সেখানে নিয়ে এলেন। বাম্বলও সব স্বীকার করলেন।

১৪

বিল লণ্ডনে ফিরে টেমস নদীর ধারে এক কুখ্যাত পল্লীর মধ্যে একটা পুরনো ভাঙা বাড়িতে এসে উঠল। পুলিস অনুসন্ধান করতে করতে সেই বাড়ির সামনে এসে হাজির হল। সঙ্গে কিছু লোকও জুটে গেল।

বিল প্রাণ বাঁচাতে একবার শেষ চেষ্টা করল। সে একটা দড়ি নিয়ে ছাদে উঠে দড়ির একদিক চিমনীতে বেঁধে আর একদিক নিজের দেহের সঙ্গে জড়িয়ে নিল। ভাবল ছাদ থেকে লাফিয়ে বাড়ির পেছন দিকে নেমে পালিয়ে যাবে। বিল লাফিয়ে পড়ল বটে কিন্তু দড়িটা তার গলায় আটকে গেল! ফাঁসিকাঠে ঝোলার মত দুলতে লাগল—দেহ থেকে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

১৫

ফ্যাগিন জেলে বন্দী। তার অপরাধের শাস্তি—ফাঁসি! অতীতের দুষ্কার্য তার মনে এসে ভীড় করছে! জেলে বসে চারদিকে সে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখছে। মাঝে মাঝে পাগলের মত চিৎকার করে উঠছে! আবার অনুশোচনায় ছোট ছেলের মত কাঁদছে আর মাথার চুল ছিঁড়ছে!

তার শেষ দিনে ব্রাউনলো ও অলিভার তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মঙ্কস কতকগুলো দলিল ও কাগজপত্র ফ্যাগিনকে দিয়েছিল। সেগুলো সে লুকিয়ে রেখেছিল। ব্রাউনলো সেগুলোর সম্বন্ধে ফ্যাগিনকে জিজ্ঞেস করলেন। ফ্যাগিন অলিভারকে কাছে ডেকে তার কানে ফিসফিস করে সেই লুকানো জায়গার সন্ধান বলে দিল। অলিভার ভগবানের কাছে তার জন্যে প্রার্থনা করল। ফ্যাগিনের ফাঁসি হয়ে গেল।

ফ্যাগিনের মৃত্যুর পর বেট্‌স একটা খামারে নতুন করে জীবন শুরু করল। মঙ্কস আমেরিকায় গিয়ে সমস্ত টাকা নষ্ট করে জেলে জীবন শেষ করল।

ব্রাউনলো অলিভারকে তাঁর উত্তরাধিকারী করলেন। মিস্‌ মেইলি ও রোজের বাড়ির কাছে একটা বাড়ি নিয়ে বাস করতে লাগলেন। তাঁরা সকলেই সুখে ও আনন্দে জীবন কাটাতে লাগলেন। অলিভারের দুঃখ কষ্টের অবসান হল।

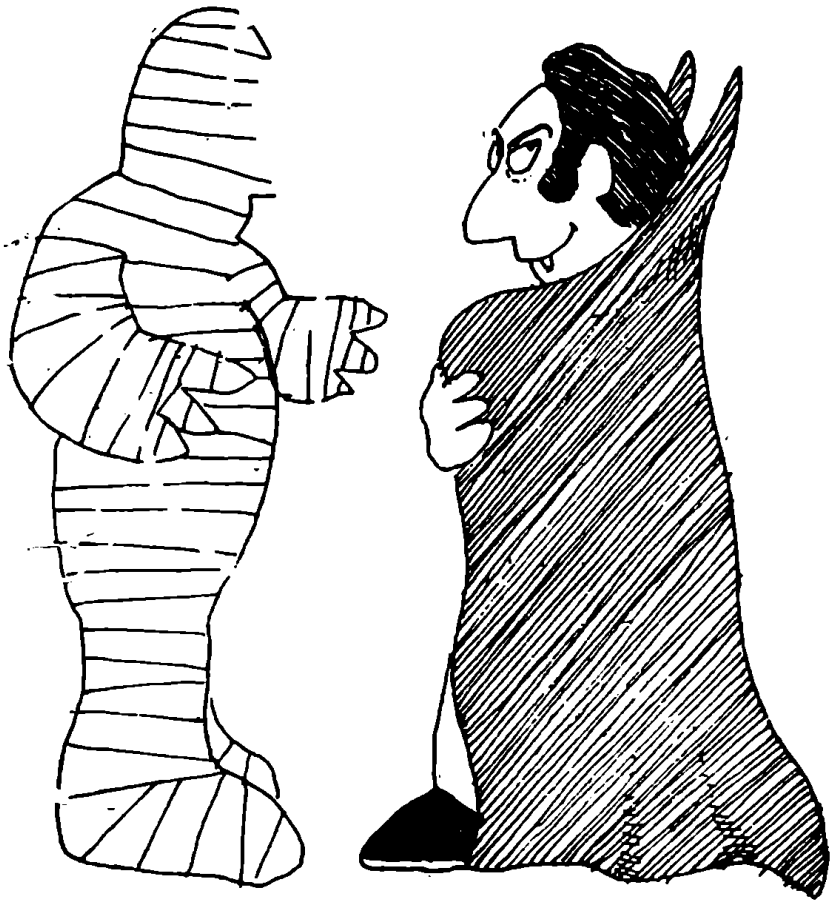

মমির রহস্য

অমিতাভ সেন

মেসো লুকাস-এর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বেকার ও স্বভাবদুর্বৃত্ত লোগান উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। পুরাতত্ত্ববিদ লুকাস ও মাসী হ্যারিয়েটের কোন ছেলেপিলে হয় নি। আর লোগান হ'ল তার মাসীর একমাত্র বোনের একমাত্র সন্তান। লোগানের বাবা-মা দুজনেই মৃত। মাসী হ্যারিয়েটের সমস্ত সম্পত্তির সে একমাত্র উত্তরাধিকারী—যদি সে মাসীর বিশ্বাসভাজন হতে পারে।

ছটফট করছে লোগান—কবে মাসীর ডাক আসবে। এক পা বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে সে।···শেষ পর্যন্ত মাসীর আমন্ত্রণ এলো।

লোগান মাসীকে খোশামোদ করে খুশী করার চেষ্টা করে। লণ্ডন শহরের ওপর তার বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। ঘিঞ্জি, আলো বাতাস নেই, ধোঁয়াশায় নিঃশ্বাস নেওয়া কঠিন! চেঁচামেচি, গোলমাল, মোটরের হর্ন—হাজার রকমের শব্দে কান ঝালাপালা। নির্জন গ্রাম্যপরিবেশ। কোলাহলের বাইরে। মুক্ত বিশুদ্ধ বাতাস সেবন করে সে সুস্থ, শান্ত জীবন-যাপন করতে চায়··· ইত্যাদি, ইত্যাদি!

মাসী হ্যারিয়েটের মুখের ভাবের পরিবর্তন হ'ল না! নীরস স্বরে বলেন, বাজে কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা কোরো না লোগান। লণ্ডনে থাকা তোমার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। জাল, জোচ্চুরি, লোকঠকানো, ভূয়োচেক চালাবার চেষ্টা আরো অনেক কিছু করে এসেছ এতদিন। আমার জানতে কিছু বাকি নেই। যাই হোক্ তুমি আমার একমাত্র বোনের একমাত্র সন্তান। এখানে অনেক মূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে!

সেসব উপযুক্ত লোকের হাতে দিয়ে যেতে চাই। তুমি যে সেগুলি পাবার যোগ্য তা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। আমাদের পদবী গিব্‌স। তোমার পরিচয়ও তাই হবে। এখন চলো তোমাকে সংগ্রহশালা দেখিয়ে আনি।

প্রায় অন্ধকার সংগ্রহশালার চারদিকে মমির মূর্তি ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে। লোগান একটি মমির মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ঠাট্টা করে বলে, এই যে বন্ধু! জায়গাটা বেজায় ঠাণ্ডা, নয় কি?

হ্যারিয়েট ধমকে ওঠে—এটা ইয়ার্কির জায়গা নয় লোগান। সরে দাঁড়াও, কার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলে এখনই দেখতে পাবে।

মাসী এগিয়ে এসে শবাধারের ঢাকনা খুলতেই লোগান আঁতকে পিছিয়ে আসে—আঁ, আঁ—এযে মেসো লুকাস!

মাসী বলে, হাঁ তাই। সারা জীবন মিসর নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর মৃতদেহ মমি করে রাখাই সঙ্গত। আমাদের বন্ধু ডঃ আবু মৃতদেহ সংরক্ষণের পুরাতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। লুকাসের মুখ তাই ব্যাণ্ডেজ করা নেই।

লোগান মনে মনে চিন্তা করে বুড়ির অঢেল টাকা। আমার টাকা নেই। বুড়িকে তোয়াজ করতে হবে।

খাবার টেবিলে ডঃ আবুর সঙ্গে লোগানের পরিচয় হয়। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ, লম্বা ছুচালো মুখ, মাথা জোড়া বিরাট টাক। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে ডঃ আবু যেন লোগানের মনের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন!

নিজের ঘরে এসে লোগান মতলব ভাঁজে—কি করে মাসীর টাকাকড়ি হাতানো যায়। দরজায় খুট করে শব্দ হতে লোগান ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর একটা ভয়ার্ত চিৎকার তার গলা চিরে বেরিয়ে আসে! দু... পাল্লার ফাঁক দিয়ে একটা শুকনো মমির হাত তার ... এগিয়ে আসছে! ভয়ে লোগানের গলার স্বর ... হয়ে গেছে!...বেশ কিছুক্ষণ বাদে লোগান দ...র দিকে তাকায়—নাঃ, কোথাও কিছু নেই। সে কি স্বপ্ন দেখছিল? লোগান দ্রুত পায়ে নীচে ড্রইংরুমে নেমে ...। হ্যারিয়েট ডঃ আবুর সঙ্গে কথা বলছে, ডাক্তারের হাতে একটা শুকনো মমির হাত!

লোগান চিৎকার করে ওঠে, ওই ওই শয়তানটাই আমাকে ভয় দেখাতে গিয়েছিল দরজার ফাঁক দিয়ে ওই মমির হাতটা......

হ্যারিয়েট ধমকে ওঠে—বাজে কথা বোলো না লোগান। ডঃ আবু এ ঘর ছেড়ে কোথাও যান নি। ওই মমির হাতটা একটা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, আমাকে দেখাবার জন্যে ডঃ আবু এনেছেন।

লোগান বলে ওঠে—সংগ্রহশালা থেকে একটা ভূতুড়ে হাত আমায় ভয় দেখাতে এসেছিল? কেন? কেন?...ডঃ আবু নীরস স্বরে বলে ওরা হয়তো আপনার কোন গোপন অভিসন্ধির আঁচ করতে পেরেছে। তাই আপনাকে সাবধান করতে এসেছিল।

লোগান নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, কি সব আজে বাজে কথা বলছেন ডাক্তার! আমার আবার কি অভিসন্ধি থাকবে? দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছিলাম। আমি শুতে যাচ্ছি মাসি?

দিন যায়। লোগান হ্যারিয়েটের খোশামোদ করে তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। রোজই হ্যারিয়েটের সঙ্গে বেড়াতে যায়। মাইলের পর মাইল হেঁটে তার বিরক্তি ধরে গেছে। সেদিন হাল্কা কুয়াশায় চারিদিক ছেয়ে গেছে। লোগান হ্যারিয়েটকে বলে—আজ পথ ঘাট কিছু দেখা যাবে না। আজ আর বেড়াতে গিয়ে লাভ নেই। কিছুদূরে

পরিচারিকা দাঁড়িয়ে ছিল, ওদের কথা শুনছিল। হ্যারিয়েট বলে—এই হাল্কা কুয়াশা। পথ ঘাট আমার নখদর্পণে। চলাফেরার কোন অসুবিধা হবে না। লোগান খুব খুশী হল। পরিচারিকা সব কথাই শুনেছে, কিন্তু ঘটলে তাকে কেউ দোষ দেবে না।

পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকা বাঁকা পথে দুজনে চলেছে। হ্যারিয়েট এগিয়ে এগিয়ে লোগানকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘন কুয়াশায় এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না! লোগান হঠাৎ পিছন থেকে আক্রমণ করে হ্যারিয়েটকে পাহাড়ের গা থেকে ঠেলে, নিচে ফেলে দিলে। একটা ভয়ার্ত চিৎকার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিল। কিন্তু সেখানে সে চিৎকারে সাড়া দেবার কেউ নেই!

লোগানের মনে একটা অজানা আতঙ্ক দানা বেঁধে উঠেছে। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটল। বাড়ির পরিচারিকা এবং বাবুর্চির সামনে লোগান নিখুঁত অভিনয় করে গেল—হ্যারিয়েট পা পিছলে পাহাড় থেকে নিচে পড়ে গেছে। লোগানও পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। তারপর ছুটতে ছুটতে ফিরে এসেছে খবর দেবার জন্য।

দুদিন বাদে সমুদ্র থেকে হ্যারিয়েট গিবস-এর মৃত দেহ উদ্ধার করা হল। লোগান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মৃতদেহ কবরস্থ করতে চায়। বাধা দিলেন ডঃ আবু। হ্যারিয়েটের মৃতদেহ কবরস্থ করা হবে না। তার স্বামী লুকাসের মতনই হ্যারিয়েটের দেহও মমি করে রাখা হবে সংগ্রহশালায়। ডঃ আবুর উপর সংগ্রহশালার সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া আছে।

হ্যারিয়েটের উইল পড়া হয়ে গেলে টাকা কড়ি হাতে পেয়ে লোগান লণ্ডনে ফিরে গেল। সেখানে তার পুরোনো পেশা জুয়ায় সে ডুবে রইল।

একদিন ক্লাব থেকে বেরিয়ে সে দেখল রাস্তাঘাট ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেছে। একহাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। নিজের বাসার দিকে হেঁটে চলেছে লোগান। তার মনে হল, কে যেন তাকে অনুসরণ করছে, দারুণ আতঙ্কে লোগান প্রায় ছুটছে। সে জানে তার অনুসরণকারী কোন মানুষ নয়। এক অশরীরী আত্মা তাকে অনুসরণ করে চলেছে। হঠাৎ পেছন ফিরে সে দেখে ঘন কুয়াশা এক জায়গায় জমাট বেঁধে গেল। তার ভেতর থেকে ফুটে উঠল মাসী হ্যারিয়েটের মুখখানা। পাহাড় থেকে পড়ে যাবার আগে সে যেমন হাত বাড়িয়ে সাহায্য চেয়েছিল সেই ভাবে তার দিকে হাত বাড়িয়ে আসছে। লোগান পাগলের মত ছুটতে ছুটতে নিজের বাসায় ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু শয়তানের শাস্তি তখনও শেষ হয়নি। শোবার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই দেখে সামনে বিভীষিকা। হ্যারিয়েটের সেই বিকৃত মুখ, দুটো হাত বাড়িয়ে সে যেন তাকে ধরতে আসছে। চিৎকার করে লোগান শোবার ঘরের মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে তার পরিচারিকা ঘরে ঢুকে দেখে লোগান পাগলের মত কি সব বকছে। ডাক্তার এলেন, লোগানকে পরীক্ষা করে দেখে তিনি বললেন, ভীষণ ভয় পেয়েছেন ভদ্রলোক। কে একজন ডঃ আবুর কথা বলছেন, তাঁকে খবর দিতে হবে।

ডাক্তার আবুকে দেখে লোগান আঁতকে ওঠে। তাঁকে চলে যেতে বলে। লোগানের বিছানার পাশে বসে ডঃ আবু বলেন, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার সময় এসেছে। আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে কোন লাভ নেই। তুমিই হ্যারিয়েটকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে হত্যা

করেছ। তোমার মেসো লুকাস আর মাসী হ্যারিয়েট দুজনেই এসেছিল লুকাসের বাড়িতে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। লুকাসের আত্মা তার স্ত্রীকে বাঁচাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। আবার ফিরে এসেছে তার স্ত্রীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে। ঐ বাড়িতেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে, ওদের কাছে জবাবদিহি করার জন্যে। লোগান চিৎকার করে ওঠে, না যাবনা, যাব না। তার পরেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

লোগানের চিকিৎসা চলছে। ঘুমের ঔষধ খাইয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা হল। তারপর একদিন গভীর রাত্রে লোগানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে জামা কাপড় পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। লোগান হেঁটে চলেছে স্টেশনের দিকে, ঘুমন্ত মানুষের মত। টিকিট কিনে ট্রেনে উঠে বসল। নির্দিষ্ট স্টেশনে এসে সে নেমে পড়ল। তারপর আচ্ছন্নের মত হাঁটতে হাঁটতে লুকাসের বাড়ির দরজার সামনে এসে হাজির হোল। ডঃ আবু যেন তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। দোতলার বারান্দা থেকে বললেন, দরজা খোলাই আছে লোগান, সিড়ি দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে এসো।

দোতলার হল ঘরে উঠে এসেই লোগানের ওষুধের ঘোর কেটে গেল। জেগে উঠে সে বলল, আমি এখানে কি করে এলাম। আমাকে এখুনি লণ্ডনে ফিরে যেতে হবে। ডঃ আবু বলেন, এখান থেকে ফিরে যাবার পথ নেই লোগান। লুকাস আর হ্যারিয়েটের সঙ্গে বোঝাপড়া তোমাকে করতেই হবে। ঐ দেখ ওরা দুজনেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

লোগান ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে তার সামনে লুকাস আর হ্যারিয়েটের অশরীরী আত্মা যেন তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে আসছে, সারা ঘরে পচা মৃতদেহের পূতি গন্ধ। লোগান চিৎকার করে ওঠে তারপরই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

লোগানের চেতনা ফিরে এসেছে। ডঃ আবুকে দেখে জিজ্ঞাসা করে, আমি কি লণ্ডনের হাসপাতালে আছি? আপনি এখানে কেন?

ডঃ আবু বলেন তুমি এখনো তোমার মেসোর বাড়িতেই আছ। এখান থেকে কোন দিনই অন্য কোথাও যেতে পারবে না।

লোগান হাত পা নাড়বার চেষ্টা করে চিৎকার করে উঠে। শয়তান মমির মতন আমার হাত পা বেঁধে দিয়েছ, নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই। ভাল চাওতো শিগ্‌গির খুলে দাও।

নির্মম শীতল স্বরে ডঃ আবু বলেন তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতেই হবে। ঐ মমির শবাধারের মধ্যে তোমাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হলো। না খেয়ে, তৃষ্ণার জল না পেয়ে তুমি কত দিন বেঁচে থাক তা দেখতে হবে।

লণ্ডনের হাসপাতালে হৈচৈ পড়ে গেল। রোগী পালিয়েছে। পুলিসে খবর গেল, পুলিসের লোক খোঁজ খবর নিয়ে লুকাসের বাড়িতে হাজির হল। কেউ কোথাও নেই। শুধু সংগ্রহশালার শবাধারে তিনটি মমি রাখা আছে। পুলিস ফিরে গেল। লোগান গিবসের অন্তর্ধান রহস্যাবৃত থেকে গেল।

আরও কিছুদিন পরে হ্যারিয়েটের অ্যাটর্নি ডঃ আবুকে হ্যারিয়েটের উইলের শর্ত পড়ে শোনালেন। লোগান যদি সম্পত্তির দায়িত্ব নিতে না চায় কিংবা মারা যায় এবং তার যদি কোন উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে সমস্ত সম্পত্তি ডঃ আবুর ওপর বর্তাবে। ডঃ আবু নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, উইলের শর্ত এই রকম হবে, তা আমি জানতাম।

আর লোগান! সংগ্রহশালার এক অন্ধকার কোণে মমির শবাধারের ভেতরে তৃষ্ণায় অনাহারে লোগানের মৃত্যু হল। এক অর্থলোলুপ পিশাচের আত্মা লুকাস হ্যারিয়েটের আত্মার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেল।

কলিন্স সাহেবকে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়তে হয় মেম-সাহেবের। ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়। আজকাল সাহেব কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। না, কথাটা ঠিক বলা হলো না. বরং বলা যেতে পারে সব কিছু ব্যাপারে সে ভুল করছে, ভুলে যাচ্ছে।

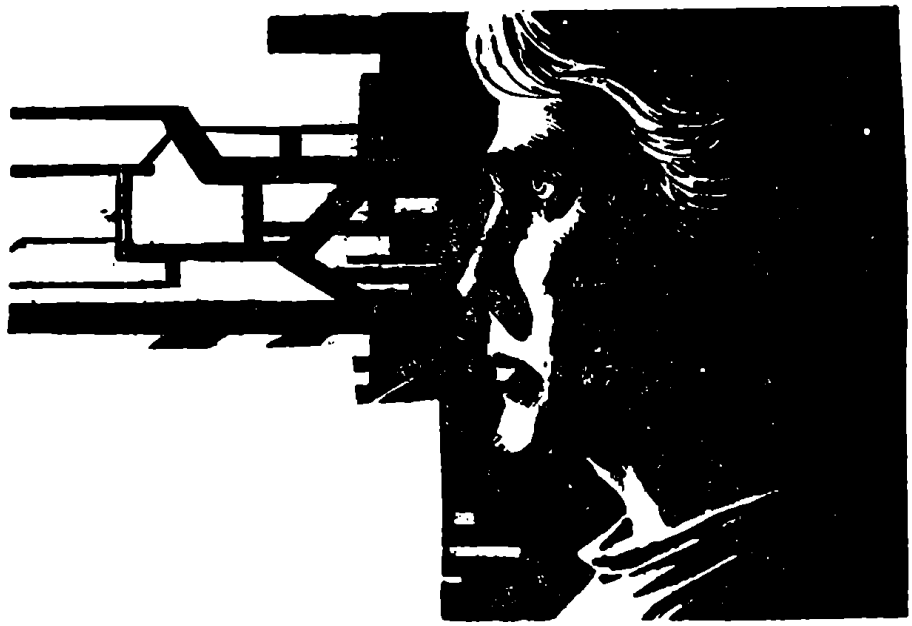

অবশেষে কলিন্স সাহেব

ইন্দ্রজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাপারটা ভাল না ঠেকায় জনার্দন বাবুকে সামনে পেয়ে মেমসাহেব জিগ্‌গেস করে, 'তোমাদের সাহেব এমন কেন হয়ে গেল ! একজন ভাল ডাক্তারকে না দেখালেই যে নয়—'

'কি হয়েছে সাহেবের ?' জনার্দনবাবুর পালটা প্রশ্নে মেমসাহেব রেলের এঞ্জিন ছাড়ার মতো দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে বলে, 'সাহেবকে নিয়ে আমার বড় জ্বালা হয়েছে জনার্দন ! ভাবছি, তাকে আর কোন কাজ কর্ম করতে দেব না। বয়স তো হলো। আর কত করবে। সারাজীবনই তো গাধা পিটিয়ে গেল। আর নয়। এবার—'

'মেমসাহেব—'জনার্দনবাবু কথার মাঝে কথা পেড়ে বলে, 'আমি সার্কাস পার্টিতে দেখেছি, গাধাকে ট্রেনিং দিতে সামনে ঘোড়াকে খাড়া করতে। আসল কথা ওনার গতিবিধি এবং আচরণটি অনেকটা জলহস্তির মতো। ঘোড়া হতে না পারায়—'

'ইউ শাট্ আপ !' মেমসাহেব, গরম তেলে বেগুন ছাড়ার মতো, চিড়বিড়িয়ে উঠলেন। অবশেষে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তুমি আমার সাহেবকে জলহস্তি বলছো ! তাতো বলবেই। এখুনি আমি সাহেবকে কথাটা জানাতে যাচ্ছি !'

'মেমসাহেব—' জনার্দন বাবু হুমড়ি খেয়ে পথ আগলে দাঁড়ায়। 'কথাটা আমার মানে বুঝলেন না।'

'খুব হয়েছে, আমাকে আর মানে বোঝাতে হবে না।'

'না মানালে যেমন 'বে-মানান' বলে শব্দ আছে তেমনি মানে না বুঝলে অজ্ঞতার লক্ষণ। তাই বলছিলাম—'

'আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না।' মেমসাহেবের রাগ কমতে চায় না।

'মেমসাহেব আপনি রাগ করছেন কেন। ব্যাপারটা আপনি একটু ভাবলেই'—জনার্দন বাবু তার কথাটি শেষ করার আগেই মেমসাহেব নাকি সুরে কেঁদে বলে, 'তুমি আমার সাহেবকে জ....হ....হ....'

মেমসাহেবের সেই 'জলহস্তি' নামক শব্দটি মুখ থেকে কিছুতেই খালাস হতে চায় না। কারণ, জনার্দনবাবুর আঙুলের ফাঁক দিয়ে চিমটের মতো

ধরে থাকা নস্যি উড়ে তাঁর নাকের গর্তে গিয়ে পৌঁছোতেই বার কয়েক হেঁচে চোখের জলে, নাকের জলে একাকার হলেন। অবশেষে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'তুমি বড় সাংঘাতিক তো। আমাকে কোন কথা বলতে দিচ্ছো না। ঐ ন্যাস্টি জিনিসটা আমার নাকে ঢুকিয়ে তুমি আমাকে জব্দ করবে ভেবেছো?'

'আমায় মাপ করবেন মেমসাহেব—, জনার্দনবাবু মুখ কাচুমাচু করে বলে, 'আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে কি ভাবে হাওয়ার পাল্লায় পড়ে আপনার নাকের গর্তে ঢুকে পড়েছে।'

মেমসাহেব একটু নরম হয়। বলে, 'ঠিক আছে। ঐ হাওয়াতেই সব গণ্ডগোল পাকিয়ে দেয়।' পরক্ষণে বলে, 'চল, একবার সাহেবকে দেখে আসবে।' জনার্দনবাবু মেমসাহেবের পিছু নেয়। রাস্তার অলি-গলি পেরিয়ে বাড়ির সামনে এসে থমকে দাড়ায়। কি যেন ভেবে মেমসাহেব বলে, 'তুমি একটু দাঁড়াও। বাড়ির ভেতর গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসি। কি রকম মুডে আছে কে জানে!'

মেমসাহেব অতি সাবধানে পায়ের পাতা ফেলে নাচের ভঙ্গিতে সামনের দিকে এগুতে থাকে। উঁকি মেরে দেখতে গিয়ে দরজার কড়াতে মাথা ঠুকে যায় জনার্দন বাবুর। আওয়াজ কানে পৌঁছতেই মেমসাহেব দৌড়ে ছুটে এসে বলে, 'তুমি আচ্ছা অসভ্য তো! অমন করে বাইরে দাড়িয়ে নাঁচা-নাচি করছো কেন?'

'না মানে—' জনার্দনবাবুকে কোন কথা বলতে দেয় না। চোখ পাকিয়ে বলে, 'আমার পিছনে পিছনে এস।'

জনার্দনবাবুও মেমসাহেবের মতো ভঙ্গি করে পিছু পিছু চলতে থাকে। সাহেবের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লক্ষ্য করে, সাহেবের মুখের সামনে খাবার সাজানো। হাতে চামচ। উদাস ভাবে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কি যেন ভাবছে। 'ঐ ছাখ, সাহেবের চোখের সামনে কিসফ্রাই, খেতে ভুলে গেছে।' মেমসাহেব কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলে।

'ভুলে গেছে?' জনার্দবাবু বিস্ময়ে জিগ্‌গেস করে।

'হ্যাঁ। আরও কত কথা বলি। যদি না মনে করিয়ে মুখে তোলাই, মুখ থেকে চামচ নামাতে ভুলে যায়। সেদিন আর এক কাণ্ড করেছে। ভুল করে বডি থেকে নিশ্বাস ফেলে, নিতে ভুলে গেছে।' মেমসাহেবও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,' অনেক চেষ্টা করেও যখন কূল কিনারা পেলাম না ডাক্তারের কাছে ছুটে যাই। তিনি জানালেন, কার্বনঅক্সাইড যখন ছেড়েছে এখুনি অক্সিজেন দরকার। নিশ্বাস নিতে ভুলে গেলেও কিছু হবে না। আপনা হতে নিশ্বাস ঢুকে যাবে। তাই আজকাল রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লে নাকের মধ্যে অক্সিজেনের পাইপটা ঢুকিয়ে দি।'

মাথা নীচু করে জনার্দনবাবু বেরিয়ে এলেন। সাহেবের জন্যে তার চোখে জল এসে যায়। অমন মানুষটা কেমন যেন হয়ে গেল। সাহেবের কথা ভাবতে জনার্দনবাবুর চোখে জল এসে যায়।

পরের দিনই মেমসাহেব নিজে ছুটে আসে জনার্দন বাবুর ডেরায়। শিশুদের দোলনার মতো মাথা দুলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'কাল হঠাৎ কখন আমার চোখ এড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে পাত্তা নেই! বাড়ি চিনতে ভুল করে ফেলেছে বোধহয়। তুমি কিছু একটা ব্যবস্থা কর।'

'পুলিসে খবর দিতে হবে! সাহেবের কোন ছবি আছে?'

'আছে। আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।' বলেই মেমসাহেব ঝড়ের গতিতে বাড়ি গিয়ে ফিরে এসে

বলে, 'এই নাও।'

মেমসাহেবের তরফ থেকে সাহেবের সম্বন্ধে সমস্ত ইতিবৃত্ত কর্ণগোচর করে দারোগাবাবু সাহেবের ছবিটি চেয়ে বসলেন।

দারোগা বাবুর টেবিলে ছবিটা রাখতেই তিনি চোখ বড় বড় করে বলে, 'একি! এতো একটা বাচ্চা ছেলের ছবি!'

মেমসাহেব চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, 'ছবিটা সাহেবের বয়স যখন বছর পাঁচেক তখনকার। কেমন চকোলেট্ খাচ্ছে দেখুন।'

'তাতে কি হয়েছে।' দারোগা বাবু বলেন, 'এ ছবি দেখে সাহেবকে চেনা যাবে না। এখনকার একটা ছবি নিয়ে আসুন।'

'আর তো ছবি নেই।' মেমসাহেব হতাশ হয়ে বলে।

'ঠিক আছে। ছবি ছাড়া কি করতে পারি ভেবে দেখি।' পরক্ষণে হাতের লাঠিটা কপালে ঠুকে বলে, 'আচ্ছা সাহেব কি ভালবাসে বলতে পারেন?'

'পারি—' মেমসাহেব জবাব দিতে লাফিয়ে উঠলেন। 'আমার সাহেব খুব চকোলেট্ খেতে ভালবাসে। সাহেবের সামনে ধরলেই হলো—'

'তাহলে কিছু চকোলেট কিনে দিয়ে যান।' দারোগা বাবু হুকুম করে।

বলার সংগে সংগেই মেমসাহেব তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে এক মুঠো চকোলেট্ বার করে বলে, 'আমার কাছেই আছে। সাহেবের জন্যেই রাখতে হয়। রেগে গেলেই চকোলেট্ দেখাই।' 'ঠিক আছে আপনি এখন যেতে পারেন।' বলেই দারোগা বাবু নিজেই একটা চকোলেট্ মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়।

থানার বাইরে পা রেখে মেমসাহেব বলে, 'আমার বড্ড মন কেমন করছে জনার্দন। সাহেবের চক্‌লেট্ গুলো দারোগা বাবু সব খেয়ে ফেলছে।'

'ও কিছু নয়। লোভে পড়ে চেখে দেখলো আর কি—' জনার্দন বাবু সান্ত্বনা দেয়।

অবশেষে কলিন্স সাহেবের সন্ধান মেলে!

ঘটনাটা স্বয়ং দারোগা বাবুই জানিয়ে বললেন, সাহেব পেটিতে প্যাকিং হয়ে ট্রান্সপোর্ট লরির মাধ্যমে ক্যালকাটা থেকে কালাকাটা। তারপর, ময়নাগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি। সব শেষে খবর এলো এখন তিনি সন্দেশখালি হয়ে ধনেখালি এসে পৌঁছেছেন। মাল খালাস করতে হবে। আপনারাও সংগে যাবেন।'

সাহেবকে পেটি থেকে খালাস করতে মেমসাহেব এবং জনার্দনবাবুকে দৌড়োতে হয়। সংগে দারোগাবাবুও থাকলেন।

পেটির প্যাকিং ভাঙতেই সাহেবের দর্শন মেলে। অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। মেমসাহেবের ডাকাডাকিতেও তার ঘুম ভাঙে না। মেমসাহেব হতাশ হয়ে বলে, 'ঘুমিয়ে পড়লে জেগে উঠতে হয় সাহেব ভুলে গেছে। এই কাঠের পেটিটি শুদ্ধু ওকে তুলে নিয়ে যেতে হবে।'

'একটা লজেন্স দেখালে হয় না' দারোগা বাবু জিগ্‌গেস করেন।

'না। লজেন্সের কথা চোখ না চাইলে মনে পড়বে না।'

কাঠের পেটিটি খালাস করে বাইরে আনতেই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর একজন হাতে একটি রসিদ গুঁজে দিয়ে জানালেন, 'মালের ওজন দুশো বাহান্ন কেজি, দশ গ্রাম। মাল বয়ে আনতে খরচ পড়েছে একশো বাহাত্তর টাকা পঁচিশ পয়সা।'

[এর পরের অংশ ১৭১ পৃষ্ঠায়]

গোলোকপতির সাহসীমানুষ বলে নাম ডাক আছে। থাকারই কথা। এক সময় পুলিসের জাঁদরেল দারোগা ছিলেন। অবসর নিয়ে আজকাল এদেশ সেদেশ ঘুরে বেড়ানোর নেশায় পেয়েছে। কোথাও অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ পেলে তো কথাই নেই। সেদিন প্রতাপগড়ের ওদিকে দুর্গম পাহাড়ী গুহার ভেতর বনমানুষ থাকার গুজব সত্যি না মিথ্যে—যাচাই করতে গেলেন। মাঝখান থেকে ডাকাতের পাল্লায় পড়ে পরনের পোশাক-আশাক খুইয়ে সে কি এক প্রাণান্তকর অবস্থা না হল। আদিবাসীদের সাহায্যে শেষপর্যন্ত আণ্ডারপ্যাণ্ট পরা অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করতে হয়েছিল।

.....গোলকপতির অন্তর্ধান রহস্য.....

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

উত্তরপ্রদেশে ইদানিং ডাকাতদের খুব রবরবা। গোলকপতি বলেন, 'যদি পুলিসে থাকতুম, ব্যাটাদের একদিনেই শায়েস্তা করে ফেলতুম।'

নাতি ঝুনু হাসতে হাসতে বলে,'এবার আণ্ডারপ্যাণ্টও খুলে নেবে। বলো না দাদু।'

'ঝুনু! তুই বড্ড অসভ্য হয়েছিস!' গোলকপতি খাপ্পা হয়ে বলেন।

আজকালকার ছেলেরা বড় নির্লজ্জ। গুরুজনদের সম্মান করে কথা বলতে জানে না। কিন্তু প্রতাপগড় ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না গোলকপতির। ডাকাতগুলো তাঁকে এমন হেনস্থা করল! এর একটা বিহিত না করে মনে শান্তি আসবে না।

ঝুনুর বাবা সুকুমার প্রতাপগড়ে সেচ বিভাগের এনজিনিয়ার। তাঁর জিপগাড়ি আছে। বিকেলে গোলোকপতি বললেন, 'সুকু, আজ তো তোমার ছুটির দিন। গাড়িটা একবার পাব নাকি?'

বাবার কথায় কোন ছেলে না করে। কিন্তু সুকুমার বাবু উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবলেন, আবার না জানি কোথায় গিয়ে বাবা এবার সরকারী গাড়িটাকেও ডাকাতের হাতে গচ্চা দিয়ে আসেন! ড্রাইভার পীতম সিংকে আড়ালে বলেন, 'দেখবে—বাবা যেন ডাকাতদের আস্তানার ওদিকে না যান।'

জিপে গোলকপতি উঠেছেন, এমন সময় ঝুনু এসে বলল, 'ও দাদু! তোমার সঙ্গে যাব।'

গোলকপতি বাঁকা মুখে বললেন, 'না। আমি অনেক দূরে যাচ্ছি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তোমার

পড়াশুনো আছে না ?'

ঝুনু কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'আজ ছুটির দিন না ? আজ তো মাস্টারমশাই আসবেন না। তোমার পায়ে পড়ি দাদু !....'

অগত্যা গোলোকপতি ঝুনুকে সঙ্গে নিলেন। পীতম সিং মুচকি হেসে বলল, 'কোথায় যাবেন বলুন সার ?'

গোলোকপতি রহস্যময় ভংগিতে হেসে বললেন, 'ওহে পীতম ! ঐ মুল্লুকে কোথাও ভেড়ার বাথান আছে জানো ? মানে পালে পালে ভেড়া পোষে যেখানে। মনে হচ্ছে, ট্রেনে আসার সময় দেখেছি একটা।'

পীতম বলল, 'সে তো লছমনপুরের ওদিকে। পাহাড় ঔর জঙ্গলভি আছে। ডাকু ভি !

ভেবেছিল, ডাকাতের কথা শুনলে গোলোকপতি ভড়কে যাবেন—সেদিন যা শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু দমলেন না উনি। শোনামাত্র বললেন, 'চলো সেখানে। জলদি চলো !'

জিপ জোরে ছুটতে থাকল। শহর পেরিয়ে নদীর ব্রিজ পেরিয়ে চড়াৎ-উৎরাই পথ। দুধারে ছোট বড় পাহাড় আর ঘন গাছপালা। কোথাও আদিবাসীদের গ্রাম। ঝুনু এতক্ষণে জিগ্যেস করল, 'ভেড়ার বাথানে কেন যাচ্ছ দাদু ?'

গোলোকপতি শুধু হাসলেন। ঝুনু অবাক হয়ে বসে রইল।

ভেড়ার বাথান একটা উপত্যকায়। পাহাড়ের ঢালে একটা ছোট্ট বসতি। বেড়ায় ঘেরা সবুজ ঘাসে ঢাকা বাথানে হাজার হাজার ভেড়া চরছে। সেখানে গিয়ে জিপ থামতেই কয়েকটা মারকুটে কুকুর গাঁ গাঁ করে তেড়ে এল। গোলোকপতি আঁতকে উঠেছিলেন। কিন্তু কুকুর গুলো একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে গাঁ গাঁ করে গজরাতে থাকল। ওপরের বস্তি থেকে দুজন লোক দৌড়ে এল একটু পরে। তখন গোলোকপতি নামলেন জিপ থেকে।

ঝুনু আর পীতম সিং অবাক হয়ে দেখল, বুড়োকর্তা লোক দুটোর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওদের বস্তির দিকে উঠে যাচ্ছেন। কুকুরগুলো কিন্তু সেখানেই দুঠ্যাঙে বসে দুঠ্যাঙ খাড়া করে জিভ দেখাতে থাকল।

কিছুক্ষণ পরে গোলকপতি ফিরলেন। সঙ্গে একটা লোকের মাথায় বস্তা। বস্তাটা জিপের পেছন দিয়ে ঢোকানো হল। তারপর গোলকপতি বললেন, 'চলো হে পীতম ! এবার ফেরা যাক। হুঁ, যাবার পথে এক টিন আলকাতরা কিনতে চাই। বুঝলে ?'

ঝুনু জিগ্যেস করল, 'বস্তায় কী আছে দাদু ? আর আলকাতরা কিনে কী হবে ?'

গোলোকপতি তেমনি রহস্যময় ভংগি করে হাসলেন। তারপর বললেন, 'দেখবি খন।'

গোলকপতি একটা আলাদা ঘরে থাকেন--যখনই ছেলের কাছে বেড়াতে আসেন ! সেই ঘরের দরজা বন্ধ করে গোলকপতি কী একটা করছিলেন,—মানে ওই বস্তাটা নিয়েই, ঝুনু হদিশ পেল না সে-রাতে।

কিন্তু সে ওত পেতে রইল। ঘুমোল না। বাবা-মা ঘুমোলে সে চুপি চুপি বেরিয়ে দাদুর ঘরের দরজায় কান পাতল। চাপা একটা শব্দ হচ্ছে। কিন্তু কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

একটু পরে দরজায় শব্দ হলে সে টের পেল, দরজা খুলে দাদু বেরুচ্ছেন। অমনি সে সরে গিয়ে বারান্দার কোনায় ডাইনিং টেবিলের তলায় গা ঢাকা দিল।

তারপর আঁতকে উঠে দেখল, দাদুর ঘর থেকে কী একটা কালো প্রকাণ্ড জন্তু বেরিয়ে এল। মিটমিটে বালবের আলোয় জন্তুটাকে বড় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। গায়ে কালো চকচকে লোম। সে হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইল।

জন্তুটা বেরিয়ে গেল সদর দরজা খুলে। তখন ঝুনু হাঁফাতে হাঁফাতে দাদুর ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। ঘরে কেউ নেই।

তাহলে কি ওই জন্তুটাই দাদুকে খেয়ে ফেলেছে? সে ভয়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিল। বাড়ির সবার ঘুম ভেঙে গেল। সে এক হইহই কাণ্ড।

ঝুনুর কথা কেউ বিশ্বাস করল না।

কিন্তু গোলোকপতি যে সত্যি বেপাত্তা! ঝুনুর বাবা থানায় ফোন করলেন তক্ষুনি। ঝুনুর মা শ্বশুরমশায়ের অন্তর্ধানে তো বটেই ঝুনুর বর্ণনা অনুসারে কালো লোমশ জন্তুটার কথা ভেবে কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। তাহলে প্রতাপগড়ের পাহাড়ে বনমানুষের গপ্পটা মিথ্যে নয়! সেই বনমানুষই রাতে হানা দিয়ে বুড়ো মানুষটিকে খেয়ে ফেলেছে।

সুকুমার যত বোঝান, বনমানুষ থাকলেও সে মানুষ খাবে কেন – ঝুনুর মা বুঝতে চান না। ঝুনু কী দেখতে কী দেখেছে!

ইতি মধ্যে পুলিস এসে গেল। পুলিস অফিসার রাঘব শর্মা গোলকপতির ঘরে ঢুকে সব তন্নতন্ন করে দেখে ভুঁড়ি চুলকে গুম হয়ে বললেন, 'হুম! ব্যাপারটা ভারি রহস্যজনক। ঘরে প্রচুর লোম পড়ে আছে কেন? আর ওই আলকাতরার টিন ওই বস্তাটা···হুম্। সবই তদন্ত সাপেক্ষ। মিঃ ব্যানার্জি, এদুটো জিনিস আমরা নিয়ে যাচ্ছি। কথা দিচ্ছি, কালকের মধ্যেই আপনার বাবার অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা করে ফেলব।'

সকালে প্রতাপগড়ের রাস্তায় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল।

দৃশ্যটা এমন অদ্ভুত যে শহরের সব লোক রাস্তার দুধারে জড়ো হল।

একটা প্রকাণ্ড কালো লোমে ঢাকা মূর্তি দুলতে দুলতে আসছে এবং একদল খাকি পোশাক পরা গুঁফো বিকট চেহারার লোক কাঁচুমাচু মুখে পিছু হাটতে হাটতে এগুচ্ছো। তাদের চেহারা অতি করুণ। কালো বিদঘুটে জন্তুটার দুহাতে বুকের কাছে ধরা অনেকগুলো বন্দুক আর পিস্তল। থানার কাছে আসতেই দারোগা রাঘব শর্মা আর সেপাইরা চেঁচিয়ে উঠলেন—ডাকু! ডাকু!

হ্যাঁ, বিখ্যাত এক ডাকাতদলকে পাকড়াও করে আনছে সেই গুজবের বনমানুষ!

বনমানুষটার কথা এতকাল শোনা গেছে বটে, কিন্তু প্রতাপগড়ের লোকের উপকার করতে সে পাহাড়ী দুর্গম খাদের অধিবাসী ডাকাতগুলোকে পাকড়াও করে আনছে! মেয়েরা বনমানুষের উদ্দেশে শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে অভ্যর্থনা করতে থাকল।

হঠাৎ সবাইকে অবাক করে বনমানুষটা মানুষের ভাষায় বলে উঠল, 'একটিন কেরোসিন! শিগগির একটিন কেরোসিন চাই!'

শুনেই রাঘব শর্মা ফিক করে হেসে বললেন, 'আসুন গোলকপতিবাবু! কেরোসিন থানায় অনেক আছে। গতপরশু এক ট্রাক চোরাই কেরোসিন ধরেছি। গায়ে ঢেলে আলকাতরা আর ভেড়ার লোম সাফ করে ফেলুন!'

ডাকাতগুলোকে ততক্ষণে সেপাইরা গারদে ভরে ফেলেছে। এই ব্যাটারাই কিনা গোলোকপতিকে সেদিন আণ্ডার প্যান্ট বাদে সব কেড়ে নিয়েছিল! এখন ভোগো।

Edgar Allan Poe

(The Tell Tale Heart)

মরেও মরেনা রাম!

১

লোকে বলে, আমি নাকি পাগল হয়ে গেছি! কেন....কেন... হাঁ, আমি খুবই নার্ভাস। অল্পতেই বিচলিত হয়ে পড়ি, চমকে উঠি! সেটা তো স্নায়বিক দৌর্বল্যের লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়! আমার মধ্যে পাগলের লক্ষণ ওরা কি করে দেখতে পেল?

গত বছর আমার জটিল অসুখ হয়েছিল। অসুখ সেরে গেছে—পরিবর্তনের মধ্যে বুঝতে পারি আমার অনুভূতি আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। সবচেয়ে তীক্ষ্ণ হয়েছে আমার শ্রবণ শক্তি! স্বর্গ ও মর্তের অনেক কিছু রহস্যময় শব্দ আমি এখন শুনতে পাই! নরকের নারকীয় কোলাহলের ঢেউও মাঝে মধ্যে আমার কানে এসে আছড়ে পড়ে! তাই বলে, লোকে আমায় পাগল বলবে কেন?

যাক, তাহলে ঘটনাটা গোড়া থেকেই খুলে বলি। সব কথা যে ভাবে গুছিয়ে বলবো, তার থেকে পাঠক-শ্রোতারা সহজেই বুঝতে পারবেন আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি হয় নি। মতলবটা আমার মাথায় কি করে এলো জানি না। তবে একবার মাথায় ঢোকার পর দিনে রাতে মতলবটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো। আমি যা করতে চাইছি তার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই।....মাথার মধ্যে একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে, খুন করতে হবে, ওই বুড়ো লোকটাকে!....এই বুড়ো লোকটি হল আমার বাড়ি-ওয়ালা, তার বাড়িতে ঘর ভাড়া করে থাকি। তাকে ঘৃণা করি না। বরং তাকে ভালই বাসি। সে আমার কোন অনিষ্ট করে নি, চড়া কথা বলে নি, অপমান করে নি কোন দিন। জানি, বুড়ো লোকটা

বেশ কিছু সোনা দানা জমিয়েছে। কিন্তু তার সোনা দানার ওপর আমার কোন লোভ নেই। তা হলে....

শকুন-চোখ বাড়িওয়ালা হার্কার

হাঁ, ওর চোখ দুটোই আমাকে বিচলিত করেছে! অদ্ভুত ওর চোখ দুটো। একটা চোখ স্বাভাবিক সাদা মাটা আর পাঁচজনের মতোন। কিন্তু আর একটা চোখ?....অবিকল শকুনের চোখ! হালকা নীল রঙের চোখ—ছানি পড়ার মতন একটা পাতলা সাদা আস্তরণ রয়েছে চোখের পর্দার ওপর! ওই চোখ দিয়ে যখন আমার দিকে তাকায় মনে হয় আমার শরীরের ভেতর দিয়ে শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। রক্ত হিম হয়ে যায়।....সহ্য করতে পারি না! ওই চোখের চাউনি বন্ধ করতে হবে···কি করে? মতলবটা আস্তে আস্তে মাথার মধ্যে স্থায়ী আসন গেড়ে বসলো। ওই চোখের হাড়-কাঁপানো চাউনি বন্ধ করতে হবে—লোকটা মরে গেলে ওই চাউনি আমার মনকে আর দেবে না—মানুষ মরে গেলে তার চোখ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বুড়োকে খুন করলেই সব ল্যাঠা চুকে যাবে। শকুন-চোখের হাড় হিম করার দৃষ্টি নিষ্প্রভ করার সমস্যার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়ে মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। আপনারা কি এটা পাগলের লক্ষণ বলে মনে করবেন?

পাগলরা তো কোনও কাজই গুছিয়ে করতে পারেনা তাদের একটা কাজের সঙ্গে আর একটা কাজের কোনও সঙ্গতি থাকে না। কিন্তু আমার কর্ম পদ্ধতিতে কোনও ত্রুটি ছিল না। নিখুঁত পরিকল্পনায় ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছি, শেষ পর্বে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে আমার কাজ হাসিল করেছি।

২

এরপর শুরু হল প্রস্তুতি পর্ব। শকুন-চোখ বুড়ো যাতে আমাকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে সেজন্য আমি প্রতিদিন সকালে বৃদ্ধ বিছানা থেকে ওঠার আগেই তার ঘরে গিয়ে হাজির হতাম 'সুপ্রভাত? সুপ্রভাত সার? কেমন আছেন? রাত্রে সুনিদ্রা হয়েছিল? ঝলমলে রোদ উঠেছে, এখন কি আর বিছানায় শুয়ে থাকার সময় আছে? উঠে পড়ুন! উঠে পড়ুন!' তার পরই ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতুম।

আমার আসল কাজ হত কিন্তু রাত্রে! একটা ঢাকনা দেওয়া লণ্ঠন যোগাড় করেছি। লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে ঢাকনা দিয়ে রাখলে বাইরে কোনও আলো বেরোবে না। ঢাকনাটা সামান্য ফাঁক করলে আলোর সরু একটা রশ্মি বেরিয়ে আসবে। প্রতিদিন রাত দুপুরে বুড়োর শোবার ঘরের দরজার সামনে

বার্টন—সুপ্রভাত মি হার্কার

হাজির হতাম। জানি এই সময় বুড়ো গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। বিছানায় মড়ার মতন পড়ে থাকে। লণ্ঠনটা জ্বেলে ঢাকনা বন্ধ করে, সেটা হাতে নিয়ে বুড়োর দরজার সামনে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতাম অন্ততঃ মিনিট দশেক। আগেই বলেছি আমার শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ হয়ে গিয়েছে। দরজার বাইরে কান পেতে শুনি, বুড়োর কোনও সাড়া শব্দ পাই কি না! নাঃ, কোনও সাড়া শব্দ নেই।

খুব সাবধানে দরজার হুড়কোটা নামিয়ে দিই—না, কোনও শব্দ হয়নি! তারপর দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করি। আবার মিনিট পনের অপেক্ষা করি। তারপর দরজার সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মাথাটা গলিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। সব কাজই হচ্ছে নিঃশব্দে! আপনারাই বিচার করুন কোনও পাগলের পক্ষে সুপরিকল্পিত ভাবে এতো সন্তর্পণে কাজ করা সম্ভব?

ঘরের মধ্যে মাথা গলিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে। তারপর লণ্ঠনটা ঘরের মধ্যে এনে ঢাকনাটা ঈষৎ ফাঁক করি। সরু একটা রশ্মি ঘরের মেঝের ওপর পড়ে। লণ্ঠনটা এবার উঁচু করে ধরি। আলোর রশ্মিটা বুড়োর শকুন-চোখের ওপর পড়ে।

—নাঃ হ'লো না। বুড়োর শকুন চোখ মুদ্রিত। বুড়ো দুটো চোখ বুজে ঘুমাচ্ছে। বুড়োর ওপর আমার কোনও রাগ নেই, সে আমার কোনও ক্ষতি করে নি। তার সঙ্গে সদ্ভাবই আছে। সে বাড়িওয়ালা, আমি তার ভাড়াটিয়া। আমার আসল রাগ তার ওই শকুন-চোখের ওপর। ওই চোখের চাউনি আমি সহ্য করতে পারি না। ওই চোখের আলো চিরদিনের মতন নিভিয়ে দেবো—আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।...কিন্তু চোখটাতো বোজানো—তার

মাঝরাতে বার্টন শোবার ঘরের দরজা খুলছে

গা জ্বালা করা দৃষ্টি তো দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই কাজ হাসিল না করেই ফিরতে হ'ল। আলোর ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলাম। নিঃশব্দে দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে এনে সাবধানে দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

৩

সাতটা রাত কেটে গেল ব্যর্থ অভিযানে। প্রতি রাত্রে মাঝরাতে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরেছি, লণ্ঠন থেকে সরু আলোর রশ্মিটা বুড়োর মুখের ওপর পড়েছে নাঃ, শকুন-চোখ বুজিয়ে বুড়ো ঘুমাচ্ছে—অকাতরে। এল অষ্টম রাত্রি। অন্যদিনের চেয়ে আমি বেশী সতর্ক। সন্তর্পণে ঘরের দরজাটা একটু একটু করে ফাঁক করছি।

ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটাটাও বোধ হয় এর চেয়ে দ্রুতগতিতে চলছে! চাপা উত্তেজনায় সারা শরীরে বিদ্যুতের শিহরণ।

—একটু একটু করে দরজাটা ফাঁক করছি। বিছানায় একজন নিশ্চিন্তে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। আমার অভিলাষ আমার মনের গভীর অন্দরে লুকিয়ে আছে। বুড়ো তার হদিশ পাবে কি করে ··মনটা হাসি-খুশীতে ভরে উঠেছে। বাইরে তার প্রকাশ নেই। টুঁ শব্দটি নেই! তবুও বুড়ো বিছানায় নড়ে উঠল। আসন্ন চরম বিপদের আশঙ্কা কি সে বুঝতে পেরেছে? আমার মনের অভিলাষ কি একটা অদৃশ্য তরঙ্গের আকারে তার অবচেতন মনকে নাড়া দিয়েছে?

আমি কি ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছিলাম? দরজা ঈষৎ খোলা রেখেই ভয়ে পালিয়ে গিয়ে ছিলাম?—

আদৌ না। ঘরের মধ্যে নিকষ কালো অন্ধকার। চোর ডাকাতের ভয়ে বুড়ো সব জানালা ভিতর

লণ্ঠনের ঢাকনায় হাত পড়তে শব্দ হল

থেকে চেপে বন্ধ করে রাখে। আমার পরনে কালো পোশাক। বুড়ো আমাকে দেখতে পাবে না!

একটু একটু করে দরজার পাল্লা দুটো ফাঁক করছি। মাথাটা ঘরের ভেতরে ঢুকেছে। আলো জ্বালাতে গিয়ে হাত পিছলে লণ্ঠনের টিনের ঢাকনার ওপর পড়ল—একটা ধাতব শব্দ হল।

বুড়ো বিছানায় উঠে বসেছে—ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে—কে, কে ওখানে?

নাড়া দিইনি। অন্ধকার ঘরে স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে আছি—যেন একটা পাথরের তৈরী স্ট্যাচু।

প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। একই স্থানে দাঁড়িয়ে আছি আমি—পাথরের মূর্তির মতন নিথর। বুড়ো এখনও বিছানার ওপর বসে আছে, তার শুয়ে পড়ার

আতঙ্কে বৃ র্কার বিছানায় উঠে পড়েছে

কোনও শব্দ আমার কানে আসেনি। বুড়ো বোধ হয় কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করছে—ঘরের মধ্যে সত্যিই কেউ ঢুকেছে কিনা! একটা ঘুরঘুরে পোকা ঘরের মধ্যেই কোথাও একটা কাঠের ভেতরে গর্ত করছে, টক্ টক্ শব্দ হচ্ছে। লোকে বলে, এই পোকা গুলো মৃত্যুর দূত। কারোর মৃত্যুর আগে এই শব্দ নাকি শোনা যায়। কাকতালীয় বলে মনে হলেও, বুড়োর ক্ষেত্রে আজ এই 'প্রবা সত্যি হতে চলেছে।

একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ কানে এল। এই শব্দটা আমার অপরিচিত নয়। না—কোনও যন্ত্রণার কাতরানি নয়। মন যখন একটা অজানা আতঙ্কে ভরে ওঠে, মনে হয় যেন চারদিক থেকে অশরীরী হাত গলা টিপে মারতে এগিয়ে আসছে, তখনই ভয়ার্ত মনের গভীর থেকে এই আতঙ্ক-ভরা আর্ত-চিৎকার বেরিয়ে আসে।

এই আতঙ্কে ভরা গোঙানি স্বর আমার অপরিচিত নয়। কঠিন অসুখের সময় যখন শরীর ও মন দুইই ভেঙে পড়তে বসেছিল, স্নায়ু-দৌর্বল্য যখন আমাকে কাবু করেছিল, তখন বিনিদ্র রজনী যাপনের সময় এই ধরনের গোঙানি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতো!

নে মনে হাসছি। অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে বিছানার-ওপর-উঠে-বসা-বুড়োর অবস্থা কল্পনা করতে আমার অসুবিধা হয় নি।....বিছানায় বসে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করে কিছু দেখতে না পেয়ে শকুন-চোখ মনকে প্রবোধ দিচ্ছে—নাঃ, ওসব কিছু নয়। ঘরে কেউই ঢোকে নি, একটা সাড়া শব্দ পাওয়া যেত তাহলে।—চিমনির ভেতর দিয়ে বাতাস চলাচলের

আলোর সরু রশ্মি শকুন চোখের ওপড় পরেছে

ফলে ও ধরনের শব্দ হতে পারে...মেঝের ওপর দিয়ে হয়তো একটা ইঁদুর ছুটে চলে গেছে.... ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক নয় তো ?

বুড়ো নিশ্চয়ই এধরনের নানা কল্পনার জাল বুনে নিজের মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছে—মনে সাহস আনার চেষ্টা করছে,···সবই বৃথা চেষ্টা। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে। মৃত্যুর কালো ছায়া বুড়োর ভীত সন্ত্রস্ত মনের ওপর ছাপ ফেলছে। চোখে দেখতে না পেলেও, বুড়ো অনুভব করছে মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে একজন অপেক্ষা করছে, ঘরের ভেতরে নিকষ কালো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে সে !

বুড়ো বিছানার ওপর বসে আছে। বিছানায় শুয়ে পড়ার কোন লক্ষণ নেই—সে সামর্থও বোধ হয় তার নেই !

আর দেরী করা বৃথা ! অতি সাবধানে, কোনও আওয়াজ না করে, লণ্ঠনের ঢাকনা সামান্য একটু সরিয়ে দিলাম। একটা সরু আলোর রশ্মি বেরিয়ে এলো লণ্ঠন থেকে—রশ্মিটা সোজা গিয়ে পড়লো—বুড়োর আতঙ্কে বিস্ফারিত শকুন-চোখের ওপর !

শকুন-চোখ ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে সেই আলোর রেখার দিকে। সেই ঘোলাটে হালকা নীল রঙ, চোখের মণির ওপর যেন পাতলা একটা পর্দা রয়েছে। সেই হাড়-হিম-করা চাউনি—যা দেখলে আমার মনের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে !

আমি পাগল হয়ে যাইনি। যা বলছি তা' পাগলের প্রলাপ নয় ! আগেই বলেছি, অসুখের পর আমার শ্রবণ-শক্তি এতো তীক্ষ্ণ হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষে যা শুনতে পায় না সেই ক্ষীণ শব্দও আমার কর্ণগোচর হয়। শুনতে পাচ্ছি একটা মৃদু ঢ্যাবঢেবে আওয়াজ, নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে আওয়াজটা হচ্ছে। যেন তুলো দিয়ে মুড়ে রাখা ঘড়ি অবিরাম টিক টিক শব্দ কচ্ছে ! ওই শব্দটা কি, তা আমি জানি। ভীত

বার্টন লণ্ঠনটা উঁচু করে দেখছে

সন্ত্রস্ত বুড়োর হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুকুনি আমার কানে আসছে।

8

বুড়োর হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনির শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। ভয় পেলে মানুষের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়। এ কারণেই নাকি আতঙ্কে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বুড়ো কি ভয়ে হার্ট ফেল করবে ? কান পেতে ধুকধুকুনির আওয়াজটা শুনি। হাঁ, হৃৎস্পন্দনের গতি বেড়েছে, বাড়ছে। ভয় পেয়ে বুড়ো যেন

হাঁপাচ্ছে! বুড়ো যেন বুঝতে পারছে তার অন্তিম মুহূর্ত এগিয়ে আসছে!

ধুকধুকুনির শব্দটা ক্রমেই বাড়ছে। বন্ধ ঘরে আওয়াজটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, গমগম্ করছে ঘরটা। আওয়াজটা বেড়েই চলেছে। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ থাকলেও, আওয়াজটা কি দেওয়াল ভেদ করে আশেপাশের বাড়ির প্রতিবেশীদের কানে পৌঁছাবে?

সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আওয়াজটা বাইরের কারো কানে পৌঁছালে, সব ভেস্তে যাবে। আর দেরী করা চলে না!

লণ্ঠনের ঢাকনাটা পুরোপুরি খুলে দিয়ে লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরলাম। সমস্ত আলো বুড়োর মুখের ওপর গিয়ে পড়েছে। আলোর পিছনে আমি, কালো পোশাকে আবৃত শরীরটা বুড়োর চোখে অদৃশ্য। বুড়োর মুখে চোখে অপরিসীম ভয়। আতঙ্ক ফুটে উঠেছে - শকুন-চোখ বিস্ফারিত, যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ঘৃণায় সারা শরীর কেঁপে উঠলো। ওই চোখটা চিরদিনের মতন বুজিয়ে দিতে হবে।

হয়তো একটা চাপা জান্তব স্বর আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। বুড়ো ভয়ে বিছানা থেকে নামতে গিয়ে বিছানার চাদরে পা জড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

এইতো সেই সুযোগ যার প্রতীক্ষায় আমি ছিলাম। আতঙ্কে বিস্ফারিত শকুন-চোখ লণ্ঠনের আলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। বুকের ধুকধুকুনি শব্দটা যেন আরও জোরালো হয়েছে। দেরী করা চলবে না প্রতিবেশীরা যদি আওয়াজটা শুনতে পায়!···

লাইটটা মেঝের ওপর নামিয়ে রাখলাম। বুড়ো এখন শকুন-চোখ দিয়ে দেখে আমাকে চিনতে পারুক বা না পারুক কিছু যায় আসে না। এক ঝটকায় বিছানা থেকে তোষকটা টেনে এনে বুড়োর মুখের ওপর চেপে ধরলুম।

তোষকটা বুড়োর মুখের ওপর চেপে ধরেছি

বুড়োর বুকের ওপর চেপে বসে মুখের ওপর তোষকটা ঠেসে ধরে রেখেছি। ছটফট করছে বুড়ো। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, দম বন্ধ হয়ে আসছে।··· কিছুক্ষণ ছটফটানি। ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসছে বুড়োর শরীরটা। কতক্ষণ কেটে গেল, কে জানে। আমার কোনও তাড়া নেই। ওই শকুন-চোখের কুৎসিত চাউনি চিরতরে নিভিয়ে দিতে হবে। না হ'লে আমার সোয়াস্তি নেই!

বুড়োর শরীরে আর কোনও সাড়া নেই। বুকের ধুকধুকুনিও বন্ধ হয়ে গেছে। বুকের ওপর কান রেখে হৃৎস্পন্দন শোনার চেষ্টা করি। নাঃ, থেমে গেছে, নাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। সব শেষ, বুড়ো আর

ইহজগতে নেই। মুখের ওপর থেকে তোষকটা সরিয়ে নিই। উল্লাসে চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে, নিজেকে সামলে নিই। প্রতিবেশীরা শুনতে পাবে। শকুন-চোখ চিরদিনের মতন বুজে গেছে। তার ওই বীভৎস চাউনি আর আমায় কোনও দিন পীড়িত করবে না। নিখুঁত পরিকল্পনায় ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়ে আজ আমি সফল হয়েছি!

আমি কি পাগল? যারা আমাকে সে আখ্যায় ভূষিত করবে, তাদেরই মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়েছে, তাদেরকেই পাগলের ডাক্তার দেখান দরকার যে নিখুঁত পরিকল্পনায় আমি কাজ করেছি, কোনও অস্থির চিত্ত পাগলের পক্ষে তা করা কি সম্ভব? বুড়োর লাশ গায়েব করার জন্যে আমি যে-সব ব্যবস্থা করেছিলাম, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে যে আমি পাগল নই।

আমার প্রথম কাজ হল, বুড়োর মৃতদেহটা লুকিয়ে ফেলা। যা করতে হবে, আগে হতে মনে মনে ঠিক করা ছিল। এই অঞ্চলের অন্যান্য বাড়ির মতন এই বাড়ির দোতলার ঘর-বারান্দার মেঝে তৈরী হয়েছে একতলার সিলিং-এর ওপর মোটা কাঠের তক্তা পেতে। তক্তাগুলো নিখুঁত ভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তক্তার ফাঁক দিয়ে জল চুঁইয়ে নীচের তলায় পড়ে না। ওপর তলায় অল্প বিস্তর দাপাদাপি করলেও নীচের তলায় বিশেষ আওয়াজ পৌঁছায় না।

বুড়োর শোবার ঘরে কয়েকটা লম্বা কাঠের তক্তা তুলে ফেললাম। সিলিং আর তক্তার মাঝখানে যে ফাঁক আছে, তার মধ্যে বুড়োর মৃতদেহ লম্বা করে শুইয়ে দিলাম (এটা যে সম্ভব তা আগেই পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছিলাম আমার নিজের ঘরের তক্তা তুলে, গর্তর গভীরতা মেপে দেখে।) পা-দুটো লম্বা টান করে রাখা। দেহের দুপাশে দুটো হাত। দেখলে মনে হবে, বুড়ো যেন চোখ বুজে ঘুমাচ্ছে। তারপর নিখুঁত ভাবে কাঠের তক্তাগুলো নির্দিষ্ট

মেঝের কাঠের পাটাতন তুলে কবর দিলুম

স্থানে বসিয়ে দিলাম। সামান্য যা ধুলো পড়েছিল, ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে ভালোভাবে লক্ষ্য করতে থাকলাম। নাঃ, কোথাও ত্রুটি নেই। বুড়ো বেঁচে থাকলে, সেও বুঝতে পারতো না যে মেঝের তক্তা তুলে আবার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এরপর বুড়োর শোবার বিছানার দিকে নজর দিলাম। এলোমেলো বিছানা ঠিক করে তোষক পেতে চাদর ঢাকা দিয়ে বিছানাটা এমনভাবে সাজিয়ে রাখলাম যেন মনে হবে রাতে এ বিছানায় কেউ শোয়নি। সকালে বুড়োকে দেখতে না পেয়ে যদি কেউ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে, কৈফিয়ত দেব বুড়ো সন্ধ্যে

বেলা কোন্ আত্মীয়র বাড়ি চলে গেছে। কবে ফিরবে ঠিক সেই। এর অকাট্য প্রমাণ দেবে বুড়োর বিছানা, যে বিছানায় রাতে কেউ শোয় নি!

৫

বুড়োর ঘর গুছিয়ে, সাফ-সুফ করতে রাত ভোর হয়ে এল। নিশ্চিন্ত মনে নিজের বিছানায় এসে শুয়েছি। ঘুম আসছে না। শকুন-চোখ চিরদিনের মতন বুজিয়ে দিয়েছি। একটা তৃপ্তির, আনন্দের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে সারা দেহে।

গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো। ঘণ্টার আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতে সদর দরজার কড়াটা জোরে বেজে উঠল।.... রাত না হতে কে এলো জ্বালাতে? নীচে নেমে সদর দরজা খুলতেই দেখি একজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে দুজন পুলিস!

দরজার সামনে পুলিশ

অফিসারটি ভদ্র ও নরম সুরে বললেন—অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। এটা....

বাধা দিয়ে আগেই বললাম—হাঁ, এটা মিঃ হার্কারের বাড়ি। আমার নাম চার্লস বার্টন, মিঃ হার্কারের ভাড়াটিয়া—তা আপনারা—

অফিসারটি বললেন, আপনার প্রতিবেশীরা গতকাল মধ্যরাতে একটা বিকট চিৎকার শুনে থানায় খবর দিয়েছিলেন। মিঃ হার্কার একলা থাকেন দোতলায়। তাই খোঁজ নিতে এসেছি।

অফিসারকে সাদর অভ্যর্থনা জানাই আসুন ভেতরে। সব জায়গায় খুঁজে দেখুন!

অফিসার ও তাঁর সঙ্গীরা দোতলার সর্বত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তল্লাশ করলেন, কিছুই পেলেন না। ওঁদের নিয়ে এলাম বুড়োর শোবার ঘরে। তিনটে চেয়ারে তিনজন বসে, অর্ধবৃত্তাকারে। কাঠের যে পাটাতনটার নীচে বুড়োকে কবর দিয়েছি, ঠিক তার ওপরে চেয়ার পেতে আমি বসে আছি।

অফিসার কিছু বলার আগেই আমি কৈফিয়ত দিলাম—মিঃ হার্কার ঠিক একলা থাকতেন না। দোতলার ওদিকের ঘরে আমি থাকি, ওর ভাড়াটিয়া। মিঃ হার্কার গতকাল সন্ধ্যায় এক আত্মীয়র বাড়ি গেছেন, ফিরতে দেরী হবে। কাল রাতে দোতলায় আমি একা ছিলাম। একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম মনে হয়েছিল একটা কালো লোমস হাত যেন আমার গলা টেপবার জন্যে এগিয়ে আসছে।

অফিসার বুড়োর ঘরের চারি দিক দেখলেন। বুড়োর 'কিউরিও' প্রাচীন ঐতিহাসিক জিনিসপত্র সংগ্রহ করার বাতিক ছিল। অফিসার উঠে ঘুরে

গোল হয়ে বসে আলোচনা হচ্ছে

ঘুরে সব দেখতে লাগলেন। আবার এসে নিজের চেয়ারে বসলেন! বুড়োর কবরের ওপর চেয়ারে বসে নিশ্চিন্ত মনে আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বললাম, দেখলেন তো। একটা জিনসও এদিক ওদিক হয়নি। মিঃ হার্কার যতদিন না ফিরে আসেন, ওগুলোর তদারকির ভার আমার ওপর দিয়ে গেছেন।

বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ঘরের ভেতরটা গরম। ভালো করে আলো তখনও ফোটে নি। পুলিস তদন্তে এসেছে খাবে না কিছু। গল্প করছি, নানা বিষয়ে আলোচনা বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎ···

কোথায় যেন টিকটিক শব্দ হচ্ছে! টিকটিকি ডাকছে? ঘুরঘুরে পোকা কাঠ কাটছে?—না, বেশ মোটা কাপড়ে জড়িয়ে ঘড়ি রেখে দিলে, কাপড় ভেদ করে যে টিকটিক শব্দ বেরিয়ে আসে এটা সেই রকম শব্দ! মনে পড়ল গতকাল রাত্রে বুড়োর ঘরে ঢুকে আলো না জ্বেলে অপেক্ষা করার সময় এই রকম আওয়াজ সব প্রথম শুনতে পেয়েছিলাম। সেই শব্দ পরে···। তবে কি?···

ওদের কথার এলোমেলো জবাব দিচ্ছি। কান খাড়া করে টিকটিক শব্দটা শুনছি। না এবার আর টিকটিক শব্দ নয়। মৃদু ধুকধুক শব্দ—হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের শব্দ!

বুঝতে পারছি কপালে কিছু কিছু ঘাম জমেছে—না, না, আমি ভুল শুনছি। এ হয়না, হতে পারে না। অসম্ভব! শকুন-চোখ বুড়ো তো বেঁচে নেই। তার হৃদযন্ত্র চিরদিনের মতন স্তব্ধ করে দিয়েছি আমি নিজে।

ধুকধুক শব্দ ক্রমে জোরালো হয়ে উঠছে···

আজে বাজে কথা—আওয়াজটা যেন শুনতে না পায়

আড়চোখে পুলিস তিনজনের দিকে তাকাই ! ওদের মুখে চোখে, কথাবার্তায় কোনও ভাবান্তর দেখলাম না। তবে কি আমি যা শুনছি তা ওরা শুনতে পাচ্ছে না ?—তাই বা কি করে হয় ? আওয়াজটা এখন বেশ জোরালো হয়েছে, কাঠের পাটাতনটা ভেদ করে উঠে আসছে। এখনই সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়বে !

ধুকধুক আওয়াজটা বেশ জোরের সঙ্গেই আমার কানে এসে পৌঁছাচ্ছে। তিনজন পুলিস নির্বিকার। আওয়াজটা চাপা দেবার জন্যে আমি চেঁচিয়ে কথা বলছি। কাঠের ওপর চেয়ারের পায়াটা ঘসছি।

না, আওয়াজটা চাপা পড়া দূরে থাক, আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।...পুলিসগুলো নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছে ! তাহলে, তাহলে আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্যেই অজ্ঞতার ভান করে আছে।...আমি কি পাগল হয়ে গেছি। নিজে হাতে যাকে খুন করে এই ঘরে কাঠের পাটাতনের নীচে কবর দিয়েছি রাত না পোয়াতেই কবরের মধ্যে সে বেঁচে উঠেছে আর বন্ধ হওয়া হৃদযন্ত্র আবার চালু হয়েছে ?

আমি চিৎকার করে উঠলাম তোমরা পুলিস। নিজেদের খুব চালাক মনে কর না ? শুনতে পাচ্ছ না। বুড়োর হৃদযন্ত্রের ধুকধুকুনি শব্দ ! হাঁ, এই মেঝের কাঠের নীচ থেকে বেরিয়ে আসছে ?

'হাঁ, হাঁ, আমি, আমিই সেই শকুন চোখ বুড়োকে গতকাল রাতে খুন করে কাঠের নীচে কবর দিয়েছি। বুড়োটা আবার বেঁচে উঠেছে। বুক ধুকধুক করছে।'

দ্রুত হাতে টেনে হিঁচড়ে কাঠের পাটাতন তুলে

হাঁ, আমিই খুন করে কবর দিয়েছি

বললাম এই দেখ এই সেই শকুন চোখ বুড়ো হার্কার ! —হা ভগবান ওর শকুন চোখটা আবার খুলে গেছে। ওই বীভৎস চাউনির চোখটা গেলে দেব—

পুলিস অফিসার বার্টনকে চেপে ধরলেন !

[১৫৭ পৃষ্ঠার পর]

দারোগা বাবু এবার আসল কথাটি তুলে জিগ্‌গেস করলেন, 'আচ্ছা, সাহেব তোমাদের পেটির মধ্যে কি করে প্যাকিং হলো বলতে পার ?' 'জানি না। সাহেবকেই জিগ্‌গেস করবেন।' বলেই টাকা গুনে সামনে থেকে সরে পড়ে।

সাহেবকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনায় মেমসাহেব নিশ্চিন্তি বোধ করে। সাহেবের মাথাটা সুস্থ হতেই অতঃপর পেটির মধ্যে প্যাকিং হওয়ার রহস্যটুকু খোলাস করে তিনি বলেন, 'কাঠের ঐ মস্ত বড় খোলসটা দেখে মনে হয়েছিল, আমি আমার ঘরেই ঢুকছি। দিব্বি হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ওরা সবাই মাল আছে মনে করে আমাকে আপাদমস্তক প্যাকিং করে ছেড়ে দিল। তারপর....'

'তারপর আর কি—' জনার্দনবাবু কথার মাঝে কথা জোড়া লাগিয়ে বলে, 'সোজা সাহেব সমেত পেটি চালান হলো !'

॥ ভৌতিক গল্প ॥

মৃত্যু জাগে রাতের শিয়রে

ডাঃ অভিজিৎ দত্ত

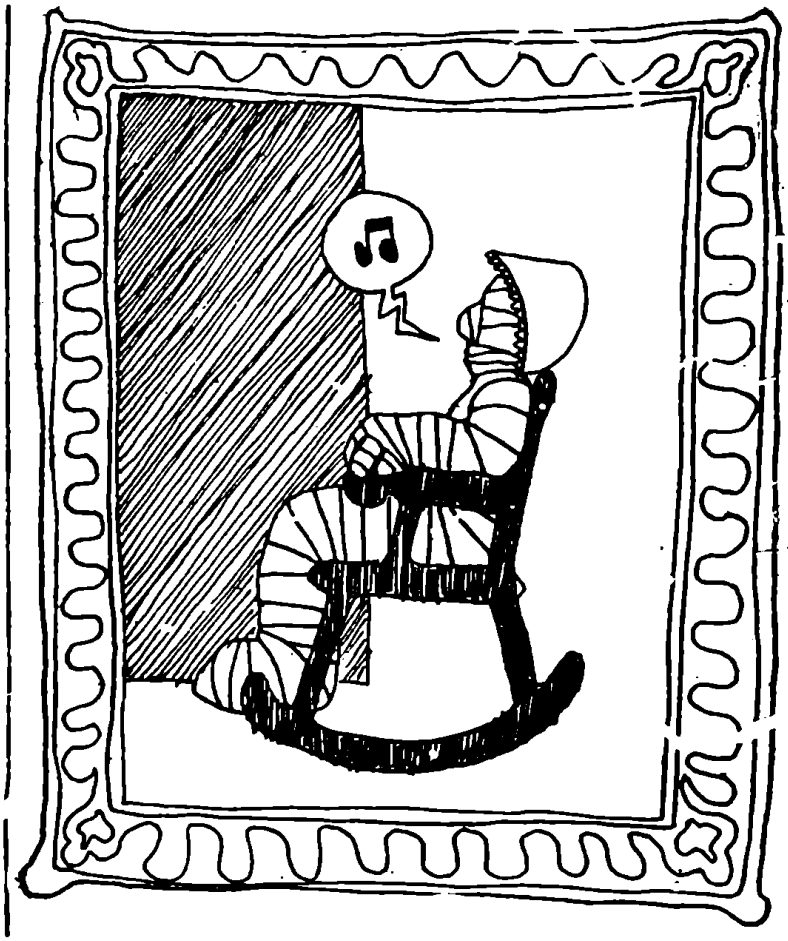

মিসর নামটা শুনলেই তোমাদের মনে কোন্ ছবিগুলো ভেসে ওঠে বলোতো? নীল নদ না সাহারা মরুভূমি? সুয়েজ খাল না পোর্ট সঈদের বন্দর? না খবরের কাগজের কয়েকটা ক্যাপশন্? যেমন আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ কিম্বা আনওয়ার সাদাতের মৃত্যু?

কিন্তু আরও পেছনে চোখ মেলো। প্রাচীন মিসর। পিরামিড, স্ফিংস। মিসরের মমি। এবং আশ্চর্য অদ্ভুত সব অপদেবতা। এপিস্, অসিরিস্, রা। অ্যানুবিস ও বুবাস্তিস্। থথ্ ও সেট্।

এসব গল্প আমরা শুনেছি আমাদের কলেজের অধ্যাপক অনুপম রায়ের মুখে। এককালে ইতিহাসের নামজাদা অধ্যাপক ছিলেন ভদ্রলোক। বিয়ে-থা করেননি। বয়স যখন চল্লিশের কোঠায়, তখন অধ্যাপনাও ছেড়ে দিলেন। বিদেশী এক পুরাতত্ত্ব গবেষণা সংস্থা নাকি নায়ারলামোটেপ, বুবাস্তিস্ এবং অ্যানুবিসের মত প্রাচীন মিসরীয় প্রেতদেবতাদের সম্পর্কে সেকালের মানুষের নানা কুসংস্কার সম্বন্ধে লেখা প্রফেসর রায়ের একটা রিসার্চ পেপার সম্বন্ধে খুব আগ্রহ দেখিয়েছিল।

ইতিহাস থেকে পুরাতত্ত্ব—অনুপমবাবুর জীবনের দিক্‌বদল হল। বিদেশী ওই সংস্থার ডাকে উনি বার বার মিসরে গেছেন। ফিরে এসেছেন স্ট্যাচু, মমি, পাথর বা মাটির পাত্র নিয়ে। বছর পাঁচেক আগেও অনুপমবাবুর নামটা তোমরা খবরের কাগজের পাতায় দেখেছো। আর দেখবে না কেন, এটা তারই গল্প। কিম্বা বলতে পারো, এটা তাঁর মৃত্যুর গল্প। জীবনের গল্প বললেও

হয়তো খুব একটা ভুল হয় না।

সার নিজে খুব সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। তুতিনটে বিদেশী ভাষা জানলেও ক্লাসে বাংলায় সবকিছু বোঝাতে চাইতেন। সাড়ে পাঁচফুট মতন লম্বা, রোহারা চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা চুলে কচিৎ কখনো চিরুনি বোলাতেন। কলেজে আসতেন সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরে, বাড়িতে সাদা পাঞ্জাবী পাজামা। পরে যখন বিদেশে গেছেন সাদা শার্ট-ট্রাউজার কিম্বা ধূসর কালো স্যুট অঙ্গে চড়িয়েছেন।

আমরা, পুরোনো ছাত্রেরা কেউ বাড়ি এলে বড্ড খুশী হতেন সার। নিজের হাতে কফি করে খাওয়াতেন। টারকিস কফির গন্ধ নাকে এলে আজও আমার ওঁর কথা মনে আসে।

ইতিহাস না পড়ে ডাক্তারী পড়লাম বলে সারের একটু অভিমান ছিল। বলতেন—'প্র্যাকটিস করলে তবু না হয় বুঝতাম। সেই মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র পড়াচ্ছো বাবা, ডাক্তারী না পড়িয়ে ইতিহাস পড়ালে কি আর এমন তফাত হতো? তোমরা তো অ্যাসপিরিন আর প্রস্টাগ্ল্যানডিন নিয়ে কতো মাতামাতি করছো। সাদা উইলো গাছের ছালের গুঁড়ো জ্বর সারায়, ব্যথা কমায়—প্রাচীন মিসরীয়রা জানতো।'

পুরোনো ছাত্রদের কাছে পুরোনো দিনের মিসরের অনেক গল্প বলতেন সার। উনি অপদেবতায় বিশ্বাস করতেন না কুসংস্কারকে কখনো পাত্তা দিতে চাইতেন না সার।

আমাদের বোঝাতেন—

'মিসরের মমি নিয়ে মানুষের কতো কুসংস্কার! অথচ কখনও ভেবে দেখেছো, কেন সেকালে মিসরের মানুষ মৃতদেহ না পুড়িয়ে বা কবর না দিয়ে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মমীভূত করে রাখতো? তোমরা একালের ডাক্তাররা বলো, রোগ সারানোর চাইতে রোগ যাতে না হয়, সেটা দেখাই বড় কথা। সেকালের বুদ্ধিমান মিসরীয় পুরোহিত-ডাক্তাররা এটা বুঝতো। লাস পোড়াবার জন্য নষ্ট করার মত কাঠ মিসরে নেই। লাস কবর দিলে নীল নদের বন্যায় কবর থেকে উঠে লাস জলে ভাসবে, কলেরা বা অন্য মহামারী হবে। তাই জনস্বাস্থ্যের খাতিরে লাস মমীভূত করে শক্ত পাথরের কাঠামোর মধ্যে রাখা দরকার কিন্তু অতো পরিশ্রম সাধারণ মানুষ করবে কেন? তাই পুরোহিত-বিজ্ঞানীরা বোঝালেন, মৃত্যুর পরেও আত্মা বেঁচে থাকে, মমিকে পিরামিডের ভেতরে আরামে না রাখলে মরা মানুষের ভূত জ্যান্ত মানুষের উপর হানা দিতে আসবে। অথচ, এর থেকেই নানা কুসংস্কারের জন্ম হল। রাজা মরে গেলে রাজার চাকরদেরও খুন করে রাজার সঙ্গে মমীভূত করে রাখা হত। কেননা মরার পরেও রাজার সেবা যত্নের দরকার হবে।

শিবপুর ট্রাম ডিপো থেকে আরও মাইল দুয়েক দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে সারের পৈতৃক বাড়ি।

সারের বাড়িটা ছিল ছোটখাট একটা মিউজিয়ামের মত। অদ্ভুত সব মূর্তি। বেশীর ভাগই পাথরের। দীঘল সাদা আলখাল্লাপরা অসিরিসের মাথায় প্রকাণ্ড তিনটে মুকুট। হাতে বিরাট এক সাপ। তার নাম 'সেট'। শৃগাল মুখ অ্যানুবিস্। বুবাসটিস্ শিশুর রক্ত শুষে খাচ্ছে। বাঁশী বাজিয়ে অসিরিসের মন্দিরের সামনে লাল গোলাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে মিসরের মেয়েরা।

অথচ সার বলতেন—

'সেকালে মিসরের পুরোহিতরা বিশ্বাস করতো

যদি ঈশ্বর থাকেন, তিনি এক ও অভিন্ন। আমাদের ঋষিরাও তো জানতেন, ঈশ্বর এক। কিন্তু সাধারণ মানুষ একজন ঈশ্বরে খুশী হয় না তাই সাধারণ মানুষের চাহিদা মেটাতে এদেশে যেমন দুর্গা, কালী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মূর্তি তৈরী হল, ওদেশেও তেমনি নানা দেবতা ও অপদেবতা কথা বলা হল।'

···তারিখটা আমার এখনও মনে আছে।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৬।

খবরের কাগজে পড়েছিলাম, মিসরে নতুন একটা মমি খুঁজে পেয়েছেন সার। দেশে ফিরে রিপোর্টার-দের বলেছেন, কোন্ রাসায়নিক পদ্ধতিতে মরা মানুষের শরীরে পচন বা বিকৃতি এড়িয়ে ওটাকে মমীভূত করা হত, এবার হয়তো তিনি জানতে পারবেন

দুদিন পরে মেডিক্যাল কলেজে ফোন এলো। সার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

তখন ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষা শেষ হতেই রাত আটটা বাজলো।

টী-বোর্ডের স্টপেজ অবধি হেঁটেই গেলাম। ওখান থেকে সরাসরি শিবপুরে যাবার মিনিবাস পাওয়া যাবে।

শীতের রাত। একটু কুয়াশা পড়েছে। কুয়াশার আড়ালে আকাশে চাঁদ উঠেছিল। শিবপুরের বাসস্টপ থেকে নেমে মেঠো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে ভালোই লাগছিল। জায়গাটা শহর থেকে খুব দূরে নয়। অথচ শহরের মত ভিড় নেই।

কলিং বেল বাজাতে সার নিজেই দরজা খুলে দিলেন। দেখে মনে হল, আগের থেকে রোগা হয়েছেন। চোখের কোণে কালি, মাথার চুল আর একটু পেকেছে।

দরজা বন্ধ করে আমায় ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে উনি চাপা গলায় বললেন—

'অভি, আসবার সময় রাস্তায় অদ্ভুত চেহারার কাউকে দেখলে নাকি?'

'না তো সার, কেউ নেই রাস্তায়

'সোনালী কুমীরের মত মুখ, মানুষের চেহারা—কাউকে দেখলে না?'

আমি আরও অবাক হয়ে বললাম —

'রাস্তা তো একদম ফাঁকা—'

যেন খুব খুশী হলেন সার। হীটারে কেটলী চড়ালেন। একটু পরেই ভেসে এল তুর্কী কফির মন-ভোলানো গন্ধ।

কফিতে চুমুক দিয়ে সার বললেন—

'এবার বড্ড ঝামেলায় পড়েছি। তাই তোমায় ফোন করেছিলাম। কি যে করা যায়, ···ওই গ্লাসকেসের ঢাকাটা খোলোতো—'

কাচের লম্বা কেসে কালো প্লাস্টিকের ঢাকনা। ঢাকা খুলতে দেখা গেল—

ভেতরে পাঁচ ফুট মতন লম্বা একটা মমি, লাল ভেলভেটের পোশাকে ঢাকা। লম্বাটে মুখটা অবিকৃত। নিষ্কলঙ্ক চোখ দুটোর দিকে তাকালে শরীরে কাঁপন ধরে। জেড পাথরের একটা সবুজ লকেট মমির পোশাকের বুকে আঁটা। সেখানে খোদাই করা সাদা রঙের দুর্বোধ্য কিছু অখর।

সার চাপা গলায় বললেন—

'প্রাচীন মিসরের পুরোহিতদের সাংকেতিক লিপি। নাকাল্। অর্থাৎ, অভিশাপ। যারা এই মমি কবর থেকে তুলে আনবে, তাদের উপর নেমে আসবে সেবেক-এর অভিশাপ।'

'সেবেক?'

সার চারপাশে তাকালেন। ওঁর মাথার একটা

শিরা হঠাৎ যেন দপ্‌দপ্‌ করে উঠলো। উনি খুব অস্পষ্ট গলায় বললেন—

'সেকালে নীল নদের উপত্যকায় উর্বরতার দেবতা ছিলেন এই সেবেক। মানুষের কল্পনায় সেবেক-এর শরীর মানুষের মত, কিন্তু মাথাটা সোনালী কুমীরের। সেবেক তুষ্ট না হলে জমি উর্বর হয়না, জমিতে কোন ফসল ফলেনা: এই ধারণা নিয়ে সেকালে চাষের মরশুম শুরু হওয়ার আগে সেবেকের পুরোহিতরা মিসরের দুচারটি কুমারী মেয়েকে কুমীরের মুখে ঠেলে দিতো।'

বুককেস খুলে পুরোন এক পুঁথি বের করলেন প্রফেসর। বইটার নাম—'রিচুয়্যালস্ অফ ওল্ড ঈজিপ্ট'। লেখক: রুডলফ প্রীন্।

সার পড়ছিলেন—

'সেকালে সেবেক-এর পুরোহিতেরা কুমীরের মুখোস ব্যবহার করিত। বৎসরে একবার অপদেবতা সেবেক স্বয়ং নাকি মেমফিসের মন্দিরে পুরোহিতদের দর্শন দিতেন। তাঁহার মস্তক কুমীরের মত, শরীর মানুষের। যেহেতু সেবেক উর্বরতার দেবতা, প্রতি বৎসর কৃষিকার্য আরম্ভ করার প্রাক্কালে মেমফিসে এক ভয়ংকর নাটক অভিনীত হইত। যদিও ইহা নাটক নয়, বাস্তব। জলাশয়ে সোনালী কুমীরের দাঁতের মধ্যে রূপসী মিসরকুমারীর কোমল শরীর। জল রক্তে লাল। এবং ০ ০ ০ সেবেক নামক সেই ভয়ংকর মিসরীয় অপদেবতার পূজারী পুরোহিতগণ জয়ধ্বনি দিতেছেন। এই পুরোহিতদের বিশ্বাস ছিল: তাঁহারা মৃত্যুর পরে একদা পিরামিডের অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং যতোদিন তাঁহাদের পুনর্জন্মের সময় না আসে, অকালে কেহ তাঁহাদের মমি পিরামিডের বাহিরে লইয়া আসিলে অপদেবতা সেবেক স্বয়ং মমি লুণ্ঠনকারীদের শাস্তি দিবেন।'

সারের গলাটা কাঁপছিল।

উনি থেমে গেলেন।

দেয়ালঘড়িটা টিকটিক শব্দ করছে

আর সব চুপচাপ।

বইটা বুককেসে রেখে উনি বললেন—

'আমি, পিটার কণ্ড আর রবার্ট ম্যাকলীন—তিনজন এই মমি পিরামিডের বাইরে নিয়ে আসি। কেননা আরব শ্রমিকরা এতে রাজী হয়নি। পিটার আর রবার্ট মারা গেছে। ম্যাইয়র্কের চিড়িয়াখানা দেখতে যেয়ে পা ফসকে এবং রেলিং ভেঙে ওরা ক্রোকোডাইল পিটে পড়ে যায়। সেখানে চারটে মানুষ-খেকো কুমীর ছিল।'

'কুমীর অপদেবতার অভিশাপ?'

—আমি আঁতকে উঠি।

'না, কাকতালীয় ব্যাপার। অভী, তুমি ডাক্তার। কুসংস্কার তোমায় সাজেনা।'

—এবার কড়া গলায় ধমক দিলেন সার।

০ ০ বাইরে কোথায় যেন রাতপাখী ডাকলো।

এ বাড়িতে সার একা থাকেন। ঠিকে লোক রান্না-বান্না সেরে সন্ধ্যে নাগাদ চলে যায়। আমার কেন যেন হঠাৎ মনে হল, সারের এভাবে একা থাকা ঠিক নয়।

মমির নিষ্কলঙ্ক চোখের দিকে তাকিয়ে সার বললেন—'দুদিন ধরে একটা লোক এ বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরছে। মুখে সোনালী কুমীরের মুখোস

'সেবেক্?—আমি আঁতকে উঠি।

'বাজে কথা বলোনা'

—সার আবার ধমক দিলেন—

'বিদেশের সংগ্রাহকরা চড়া দামে মমি কোন

লোকটা নিশ্চয়ই স্মাগলার। ভাবছে, মমিটা চুরি করবে। ওর মুখে সোনালী কুমীরের মুখোস দেখে আমি ভয় পাবো। ভাববো, সেবেক স্বয়ং এসেছে তার পুরোহিতের মমি উদ্ধার করতে। লোকটা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক। একটা মমি কিছুদিন আগে ফ্রান্সে যে দামে বিক্রী হয়েছে, আমাদের টাকার অঙ্কে তা পাঁচ লাখ টাকা। এসব কেনা ওদেশের অনেক বড়লোকের বদখেয়াল। এই স্মাগলাররা মমি চুরির ধান্দায় আছে। কি করা যায়, পরামর্শ নেব বলেই তোমায় আসতে বলেছিলাম।'

'সার, ওটা এখানে আনলেন কেন?'

'কিভাবে মৃতদেহ মমীভূত করা হত, আজও কেউ জানেনা। আমার এক কেমিস্ট বন্ধুর সাহায্য নিয়ে এব্যাপারে রিসার্চের ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ওই বদমাইস লোকটা যেভাবে পেছনে লেগেছে—'

'সার, ওটা ফিরিয়ে দিলে হয়না? হাজার হোক, মানুষের বিশ্বাস·· এমনও তো হতে পারে যে মমিটা ওদেশ থেকে এখানে আনা কারো পছন্দ নয়। ওটা যদি মিসরে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হত—'

....বাইরে রাতপাখী ডানা ঝাপটালো।

কোথায় যেন অনেকগুলো কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠলো।

জানলার বাইরে আকাশে একটুকরো মেঘ চাঁদটাকে ঢেকে দিল।

'হিম পড়ছে', সার জানলা বন্ধ করে দিলেন, তারপর বললেন, 'ওটা আমি কালই মিউজিয়মে পাঠিয়ে দেব।'

ঠিক তখনই···

....বাইরের দরজটা খুলে গেল!

সার বন্ধ ঘরে খিল লাগিয়েছিলেন আমি দেখেছি। অথচ এখন ...দরজার পাল্লা দুটো হাট হয়ে খুলে গেল।

খোলা দরজার সামনে....একটা মানুষ।

পরনে দীঘল, সাদা, সিল্কের মত চকচকে ও ঢিলে পোশাক। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটা আঙুলে পাথর বসানো সোনার আংটি। সাদা পোশাকের কলারটা কালো। এবং কালো কলারের ওপরে....সোনালী কুমীরের মুখোস। সোনালীর সঙ্গে সবুজ মিশেছে। চুল নেই, সুচোলো মুখ আধখোলা, ধারালো দাঁতের সারি এবং গোলাপী রঙের জিভ। মুখোসটা দারুণ। দেখলে মুখ বলে মনে হয়।

ততোক্ষণে আমি পেছনের দরজা আটকাবার ভারী কাঠের আগলটা হাতে তুলেছি। এতো নিখুঁত মুখোস! নিশ্চই এটার কোন উদ্দেশ্য আছে। হয়তো ধাতুর তৈরী এবং ভেতরে স্প্রিং আছে। অস্ত্র হিসেবে ওটাকে ব্যবহার করবে লোকটা। এবং সবাই ভাববে, সেবেকের কুমীর-মুখের কামড়ে সার মারা গেছেন।

'হু আর ইউ?'

—গ্লাসকেস খুলে ভারী একটা হাতুড়ি হাতে নিয়েছেন সার। উনি বলছেন—

'য়্যু আর নট সেবেক। সেবেক বলে কেউ নেই, কখনও ছিলনা।'

জবাবে লোকটা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল

....আমার হাতের ভারী কাঠটা ওর ঘাড়ে লাগলো।

···কাঠ দুটুকরো হয়ে গেল।

....সারের হাতুড়িটা ওর বুকে ছিটকে পড়লো।

....হাতুড়ি ঝনঝন করে পড়লো মেঝেয়।

....লোকটার কিছু হলো না।

গায়ে জোর আছে লোকটার।

আমি এক লাফে এগিয়ে যেয়ে ওর মুখোস ধরে টান দিলাম।

(এর পরের অংশ ১৭৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জ্ঞানের বহর

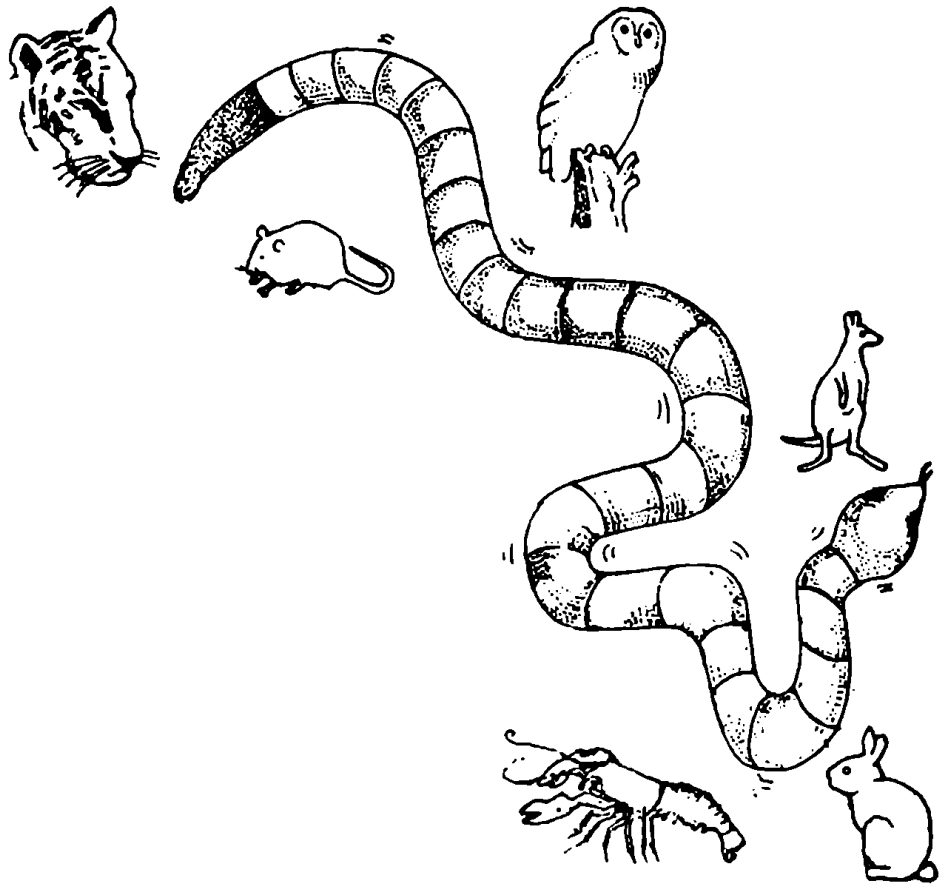

পেটুক অজগরটা এপরের ছ'টা প্রাণীকে খাবার মতলব করেছে! ওর গায়ে যে ২৭টা খোপ কাটা আছে সেখানে এই প্রাণী-গুলোর নাম পর পর বসিয়ে দাও। না পারলে উত্তরপত্রের পাতা ('চিলড্রেন্স ডিটেকটিভের') ১৮২ পৃষ্ঠায় দেখ।

এঁকে চেনো?

ইংরেজী রহস্য সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দার টুপি ও পাইপসমেত মুখের ছায়া এখানে আঁকা হয়েছে। বাড়ির লোককে জিজ্ঞেস না করে যদি বের করতে পারো, তবে বোঝা যাবে গোয়েন্দা হবার গুণ তোমার মধ্যে আছে। উঃ ১৮২ পৃষ্ঠায়।

জানো কি?

কত বছর বয়সে তুমি ভোট দিতে পারবে?

কত বছর বয়স হলে তবেই তুমি গাড়ি চালাবার অনুমতি পাবে?

এয়ার রাইফেল ও এয়ার পিস্তলের জন্য লাইসেন্স পেতে গেলে তোমায় কি করতে হবে?

মাতৃগর্ভে শিশুরা কতদিন কাটায়?

দুই ব্যাণ্ডের রেডিও বা ট্রানজিস্টার সেটের জন্য লাইসেন্স ফী কত দিতে হয়?

[সব উত্তর ১৮২ পৃষ্ঠায় দেখ]

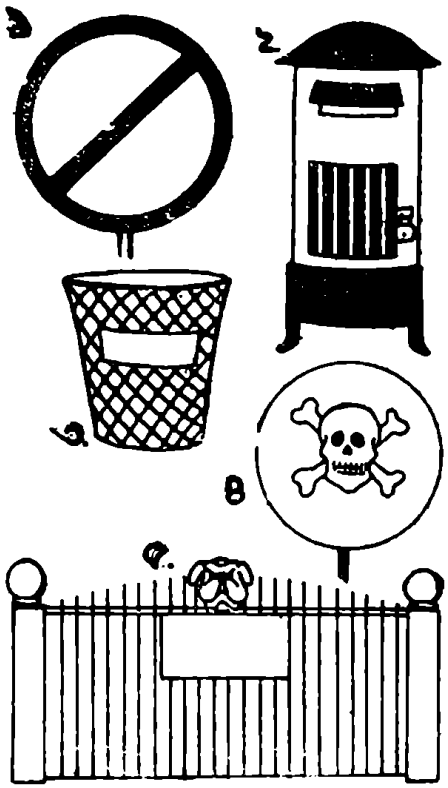

বুদ্ধির পরীক্ষা

বলোত এগুলো কি ?

নো পার্কিং চিহ্ন।

কিউ এম এস ডাকবাক্স।

বাজে কাগজ ও আবর্জনা ফেলার ঝুড়ি।

বিপদ চিহ্ন।

কুকুর হইতে সাবধান বিজ্ঞপ্তি।

উঃ—১৮২ পৃষ্ঠায় দেখ।

[১৭৬ পৃষ্ঠার পর]

পরমুহূর্তেই আমি যেন হাওয়ার টানে ছিটকে পড়লাম বাড়ির বাইরে, দরজা থেকে অনেকটা দূরে, ঘাসের ওপরে।

কোনমতে মাথা তুলে দেখলাম—

লোকটা দুহাত সামনে বাড়িয়ে সারের ঘাড়টা ধরেছে। ধারালো দাঁতগুলো তখন সারের ঘাড় ছুঁতে চলেছে। সার চিৎকার করে উঠলেন।

....রক্ত, রক্ত, রক্ত --

গ্লাসকেস খুলে মমিটা অবহেলায় তুলে নিল লোকটা।

এবং তখনই—

আলো নিভে গেল।

আমি যেখানে শুয়ে আছি, সেখান থেকে মাত্র তিন হাত দূর দিয়ে হেঁটে চলে গেল লোকটা।

অন্ধকারে ভেসে উঠলো

তার অশরীরী হাসির শব্দ!

এবং পরমুহূর্তেই....

আমার সামনেই সারের বাড়িটার জানলা থেকে, দেয়াল থেকে, ছাদ থেকে ঝলসে উঠলো নীলাভ আগুনের শিখা। বাড়িটায় আগুন ধরে গেছে।

আমি ছুটছি

মাঠ পেরিয়ে, পাথর ডিঙিয়ে...

আমি জানি, এই আগুনে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে সারের রক্তাক্ত মৃতদেহ।

আমি জানি, মমি ফিরে যাবে পিরামিডের অন্তরালে।

কেননা···

মুখোস ধরে টান দিতেই আমার হাতে লেগেছিল মাংসের ছোঁয়া।

···মুখোস নয়, মুখ।

পাগলায় নয়, অপদেবতা।

....আমি জেনেছি।

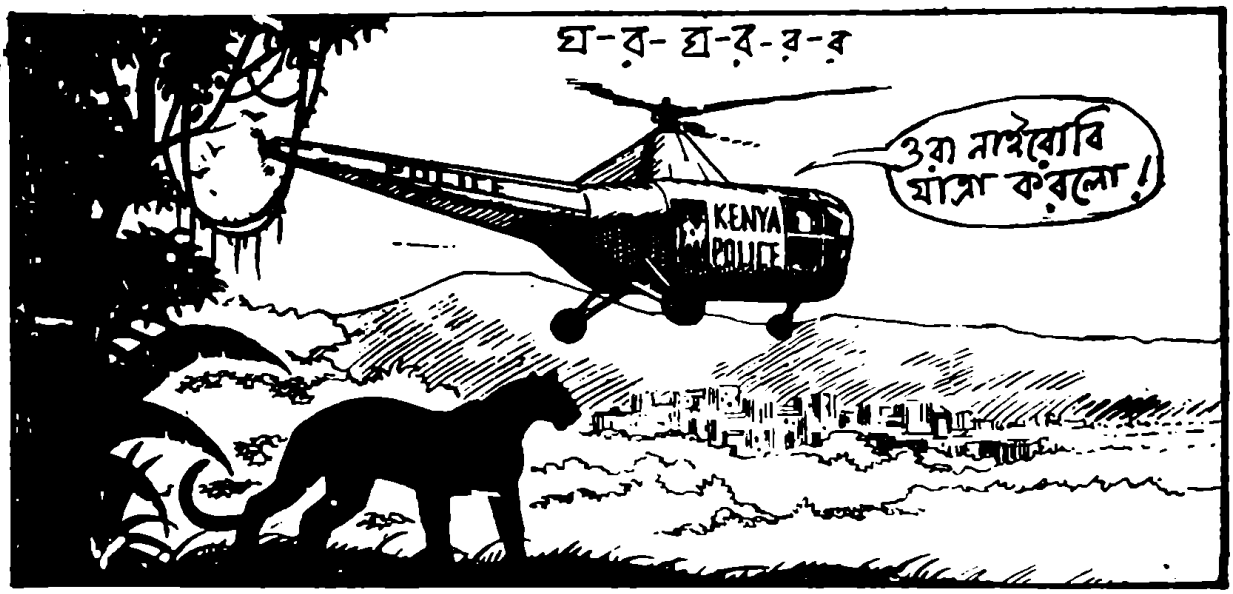

ঘ-র-ঘ্র-র-র-র
ওরা নাইরোবি যাত্রা করলো!
হোটেলের কাছে এসে গেছি!
পৌঁছে গেছি টারজান!
নি টারজান। হোটেল রেজিস্টার দেখান
এস মে ক্যাপ্টেন
মহিলার নাম জেন ক্লেটন!
হ্যাঁ, আমি জন ক্লেটন! সবাই টারজান বলে।

হাঁ, আমার স্ত্রীর সই।
উনি হটাৎ নিখোঁজ হলেন।
এখানে আমাদের আর কিছু করার নেই।
জেন এর কোন শত্রু ছিল?...
....না!
...কিন্তু আমার শত্রু অনেক — আর এই
এই স্লোভানিয়নদের সই দেখ!
দিন দুয়েক আগেই ওরা চলে গেছে?
৬

জেন এর ব্যাপারে ওদেরকে সন্দেহ করছি!
এটা তেল মানে পেট্রোলিয়ামের ব্যাপার?
তেল!
গভর্নর বিসবির সঙ্গে দেখা করতে হবে? চলুন!
কেনিয়া গভর্নরের বাড়ীতে...
তোমার কথাই ভাবছিলাম টারজান!
কেন মিঃ বিসবি?

[চলবে]

উত্তর

[১৭৭ ও ১৭৮ পৃষ্ঠার উত্তর

জানো কি

(১) ১৮ (২) ২১ (৩) এয়ার রাইফেল ও এয়ার পিস্তলের জন্য লাইসেন্স দরকার হয় না (৪) ৯ মাস (৫) দুই ব্যাণ্ডের রেডিও বা ট্রানজিস্টরের জন্য লাইসেন্স ফী লাগেনা।

বলো ত এগুলো কি ?

(১) নো পার্কিং চিহ্ন

(২) কিউ এম এস ডাক বাক্স

(৩) বাজে কাগজ ও আবর্জনা ফেলার ঝুড়ি।

(৪) বিপদ চিহ্ন।

(৫) কুকুর হইতে সাবধান বিজ্ঞপ্তি।

এঁকে চেনো

রহস্য সাহিত্যের সম্রাট স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের কাহিনীর নায়ক শার্লক হোমস্। এঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা চরিত্র বলা হয়

জ্ঞানের বহর

(১) খরগোস (২) গলদা চিংড়ি ক্যাঙ্গারু (৩) ইঁদুর (৫) পাঁচা (৬) রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

মেলায় যে প্রতিযোগিতায়র উপরের অংশ ঠিক ঠিক ভাবে ইংরেজীতে লিখে পাঠিয়েছে তারাই পুরস্কার পেয়েছে

৬টা প্রাণীর ইংরেজী :—(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬)

তন্তুশ্রী

বাংলার তাঁতশিল্প আমাদের গৌরব। আসুন আপনার আমার সক্রিয় প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় বাংলার এই ঐতিহ্যময় কুটিরশিল্পকে জীবন্ত করে তুলি। মহাজনদের হাতে শোষিত, দুঃস্থ তাঁত শিল্পীদের দ্বারা প্রস্তুত নায্য মূল্যে ঠাস বুননের চমক প্রদ তাঁত বস্ত্রের বৈচিত্র্যময় সম্ভার নিয়ে আপনাদের সেবায় আজ নিয়োজিত 'তন্তুশ্রী'। 'তন্তুশ্রী' আপনাকে জানাচ্ছে সাদর আমন্ত্রণ।

মার্কেটিং বিভাগ—১এ, অভয় গুহ রোড, কলিকাতা-৬

বিক্রয় কেন্দ্র : কলিকাতা : নয়াদিল্লী : ত্রিপুরা (আগরতলা) পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র।

তসর ও পলিয়েস্টার শার্টিং ● কটন শার্টিং রাজবলহাট ● টাঙ্গাইল সিল্ক ● সিল্ক ● ধুতি

টাঙ্গাইল ● ধনেখালি ● বেগমপুর ● শান্তিপুর ● গামছা ● টাওয়েল ● বেডসিট ● বেডকভার ● লুঙ্গি

ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এ্যাণ্ড পাওয়ারলুম ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ
(গঃ বঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৭-২২৫০, ২৭-২২৫১

ভৌতিক

অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়

তখন সন্ধ্যে হয়নি ছুটির দিন। জাস্টিস দেবনাথ মিত্রের বাড়ির দরজার কলিং বেলটা বেজে উঠলো। কিছুক্ষণ পর বেয়ারা এসে দেবনাথ মিত্রকে জানালো একজন বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

—কি নাম?

—তা তো বললেন না তিনি।

—তোকে হাজার বার বলেছি একটা কাগজে নাম লিখিয়ে আনবি!

—আজ্ঞে আমি তখন খুব ব্যস্ত ছিলাম বলে কাগজ কলম নিয়ে যেতে ভুল করেছি।

—কত বয়েস ভদ্রলোকের? সঙ্গে আর কেউ আছে?

—আজ্ঞে একাই আছেন। বয়েস কতই বা হবে তিরিশ বছরের কিছু ছোট মনে হোল।

—যা কাগজ কলম নিয়ে লিখিয়ে নিয়ে আয়। দেবনাথ মিত্র বললেন।

কিছুক্ষণ পর বেয়ারা এসে দেবনাথ মিত্রের হাতে কাগজটা দিল। কাগজে লেখা সিদ্ধার্থ বসু, ঠিকানা .....। নাম ঠিকানা পড়ে দেবনাথ মিত্র ঠিক বুঝতে পাচ্ছিলেন না এই ভদ্রলোকের পরিচয়! মনে মনে একটু বিরক্ত হচ্ছিলেন। কোন ছোকরা ব্যারিস্টার ট্যারিস্টার নাকি? ছোকরা ব্যারিস্টাররা জজেদের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় করে নিজেদের মামলার একটু সুরাহা করতে চায়। জজেদের কৃপাদৃষ্টি একটু লাভ করলে অল্পদিনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। ঘরে ঠিক এই সময়ে অনুরাধা দেবী ঢুকলেন।

—কি কাগজ ওটা? স্বামীর হাতে কাগজটা দেখে জিজ্ঞেস করলেন।

—আর বল কেন? কে একজন দেখা করতে এসেছে। নাম সিদ্ধার্থ বসু। ঠিকানা.....।

—ওঃ মা, চিনতে পারলে না? এই স্মরণ শক্তিতে জজিয়তি কর। ও তো আমাদের পিঙ্কুর বড় মাসতুতো দাদা। কতবার এসেছে। এই তো এক বছর হতে চললো বিয়ে করেছে। পাটনায় এক ব্যাঙ্কে কাজ করে। ও কি এখনো বাইরে দাঁড়িয়ে? এই বলে অনুরাধা দেবী ধমক দিয়ে বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিলেন সিদ্ধার্থকে ঘরে নিয়ে আসতে।

অল্পক্ষণের মধ্যে সিদ্ধার্থ ঘরে এলো। দেবনাথ মিত্র ও অনুরাধা দেবীকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলো কেমন আছেন ?

—এই চলে যাচ্ছে। তুমি, বৌমা কেমন আছ ? বৌমা এখন কোথায় ?

—আমরাও ভাল আছি। অনিতা পাটনায়। আমি হেড অফিসের কাজে ক'দিনের জন্য এসেছি। একটা কথা। বিনীত ভাবে সিদ্ধার্থ বললো।

—কি কথা বাবা ? অনুরাধা দেবী জিজ্ঞেস করলেন।

—আমাদের···তারিখে বিবাহ বার্ষিকী। তাই আমাদের ইচ্ছে পিঙ্কু আমাদের কাছে কয়েকটা দিন যদি থাকে। আমি পরশু দিন যাবার সময়ে নিয়ে যাব এবং এক হপ্তাহ পর কোন বিশ্বাসী লোককে দিয়ে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। ওর তো এখন স্কুল বন্ধ।

—বেশ, দাদু ঘুরে আসুক। কিন্তু বাবা ওকে একটু নজরে রেখ, একা একা কোথাও না বেরিয়ে যায়। জানতো কাশ্মীরে গিয়ে কি কাণ্ডটাই না ঘটলো ? বিপদ তো হতে পারতো ?

—পিঙ্কুর সব দায়িত্ব আমি নিলাম। কিছু ভাববেন না। এই বলে কিছুক্ষণ পর সিদ্ধার্থ উঠে পড়লো। পিঙ্কু বাড়িতে এসে পাটনায় যাবার কথা শুনে আনন্দে মেতে উঠলো। আর যেন দেরী সইছে না পিঙ্কুর। নিজেই সুটকেস বার করে নিজের পছন্দ মতো রহস্য বই ও জামা প্যান্ট ইত্যাদি ভরে রাখলো। বাকী টুকিটাকি জিনিস কাল ভরে রাখবে। পরশু সকাল ৯'টায় বাড়ি থেকে বার হতে হবে। দশটায় গাড়ি। সুতরাং পিঙ্কুর সময় কোথায় ? সকালের ট্রেনে যাবে শুনে পিঙ্কুর মনে আনন্দ আর ধরে না। রাতের গাড়িতে গেলে অন্ধকারে বাইরের কিছু দেখা যায় না। বড় খারাপ লাগে পিঙ্কুর।

নির্দিষ্ট দিনে পিঙ্কুর মাসতুতো দাদা সিদ্ধার্থ এসে পিঙ্কুকে নিয়ে গেল। পিঙ্কু সেই সকাল থেকে তৈরী হয়ে বসে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল। পিঙ্কুর মনে হচ্ছিলো আজ যেন ঘড়ির কাঁটা নড়তেই চাইছে না !

পিঙ্কু জানালার ধারেই সীট পেয়ে গেল। কি আনন্দ, ট্রেন ছাড়লো। সেই থেকে পিঙ্কু এক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। সিদ্ধার্থ একটা ইংরেজী ম্যাগাজিনে তন্ময় হয়ে আছে। ট্রেনের ভেতরের প্রতি পিঙ্কুর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। অনেকক্ষণ পর কি যেন একটা আকর্ষণে পিঙ্কু এ পাশ ফিরতেই দেখতে পেল একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণী তার ঠিক পাশে বসে আছে। দারুণ সাদা গায়ের রঙ। শরীরে যেন রক্ত নেই। মলিন মুখ। যেন দীর্ঘকাল অসুখে ভুগে এই অবস্থা হয়েছে। নিশ্চুপ হয়ে একা তরুণীটি বসে আছে। ধীরে ধীরে বাইরের দিকে পিঙ্কু আবার চোখ ফিরিয়ে নেয়। ট্রেন ইতিমধ্যে কখন আসানসোলে পৌঁছে গেছে পিঙ্কুর ঠিক হুঁস ছিল না। এবার পাশ ফিরতেই সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণীটিকে পিঙ্কু দেখতে পেলনা !

—বড়দা, অ্যাংলো মেয়েটি কি আসানসোলে নেমে গেছে। পিঙ্কু সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞাস করলো।

—কোন অ্যাংলো মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করছিস ? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ট্রেনে চড়ে।

—বাঃ রে, এই তো আমার পাশে প্রায় তোমার মুখোমুখি বসে ছিল ? পিঙ্কু বললো।

—তোর মাথা না মুণ্ডু। এই কামরায় কোন অ্যাংলো ওঠেনি, তুই সাহেব মেমেদের স্কুলে পড়িস

তাই নিশ্চয় তোদের কোন মিসট্রেসের কথা ভাব-ছিলিস। নে, এবার খাওয়া দাওয়া শুরু কর। খিদে পেয়েছে। ট্রেনে চাপলেই খিদে পায়।

পিঙ্কু চুপ করে রইলো। বুঝতে পারলো এ নিয়ে বড়দার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। বড়দা বিশ্বাসই করবে না তার কথা। কিন্তু সে কোন মিস্ট্রেসের কথা ভাবেইনি

ট্রেন আবার চলতে শুরু করে দিল। মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে পিঙ্কু পাশের দিকে দেখে। সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি বসে আছে কি না? না, পিঙ্কু আর দেখতে পেল না তাকে। রাত আটটা নাগাদ ট্রেন পাটনায় এসে থামলো। মাঝ পথে লাইন ক্লিয়ার না থাকায় ট্রেনটা লেট করেছিল। বৌদি পিঙ্কুকে সাদর অভ্যর্থনা করলো। রাতের খাওয়ার পর বৌদি পিঙ্কুকে একটি ঘরে নিয়ে এসে বললো পিঙ্কুবাবু এই ঘরে তুমি শোবে। ভয় পাবে না তো?

—আমি ভয়টয় পাই না! বেশ সাহসের সঙ্গে পিঙ্কু বললো

—এই তো চাই তুমি পুরুষ মানুষ তাই এখন থেকেই সাহসী হতে হবে। ভীতু ছেলেদের আমি একদম পছন্দ করি না। গায়ে জোর করতে হবে। আমিও কিন্তু ভয়টয় পাই না। জান, এ বাড়িতে আমি একা কত দিন দিব্বি কাটিয়ে দিয়েছি। তবে তোমায় কিন্তু একা শুতে হবে না। আমার ছোট ভাই কল্যাণ যে কলেজে পড়ে এবং ডাইনিং টেবিলে তোমার সঙ্গে আলাপ হোল সে এই ঘরেই শোবে। আমাদের তো দুটির বেশী ঘর নেই ভাই।

—ঠিক আছে বৌদি। কল্যাণদা কখন ঘুমোয়?

—ও ভীষণ ঘুম কাতুরে। শোবে আর ঘুমবে। কেন বলতো? বৌদি জিজ্ঞেস করলো।

—আমি শোবার আগে একটু গল্পের বই পড়ি কিনা। পিঙ্কু বললো।

—তাতে কিছু হবে না। তুমি স্বচ্ছন্দে পড়বে। আলো জ্বালা থাকলেও কল্যাণের অসুবিধে নেই। কয়েক পাতা পড়ার পর পিঙ্কুর দুটি চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো। কোনমতে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে পিঙ্কু শুয়ে পড়লো। পিঙ্কু দেখলো কল্যাণদা ইতি মধ্যে নাক ডাকাতে শুরু করে দিয়েছে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পিঙ্কু একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখতে লাগলো। একটা আবছা ছায়া মূর্তি! একটু একটু করে আবছা মূর্তিটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো! সকালে ট্রেনে দেখা সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি! কি করুণ মুখ। বৌদির ঘরের মধ্যে গিয়ে কি যেন খুঁজছে আর কাঁদছে। আবার পিঙ্কুর কাছে ফিরে এলো। পিঙ্কুর ঘরেও কি যেন খুঁজতে লাগলো। শেষে ব্যর্থ হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে পিঙ্কুর বিছানার এক পাশে লুটিয়ে পড়লো। পিঙ্কু একটু সরে গিয়ে আরও খানিকটা জায়গা করে দিল। কান্না থামিয়ে মেয়েটি এবার পিঙ্কুর দিকে চোখ তুলে তাকালো।

—আপনি কি খুঁজছেন? কি নাম আপনার? পিঙ্কু জিজ্ঞেস করলো।

পিঙ্কুর প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না মেয়েটি। হাত নেড়ে কি দেখালো। পিঙ্কু বুঝতে না পেরে বললো, বৌদিকে ডাকবো? ঘরের আলো জ্বেলে দেব? মেয়েটি তখনও নিশ্চুপ হয়ে রইলো। হঠাৎ পিঙ্কুর ঘুমটা ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল। কিন্তু কোথায় সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি? পিঙ্কু আশ্চর্য হয়ে গেল স্বপ্নের কথা ভেবে। কিন্তু ট্রেনে তো

সে স্বপ্ন দেখেনি! পিঙ্কু জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। পূব আকাশে তখন লাল রঙের ছোপ ধরেছে! আকাশের নিচে বেশ অন্ধকার। পিঙ্কু বুঝতে পারলো ভোর হতে চলেছে।

স্বপ্নের কথা পিঙ্কু দাদা বৌদিকে বললো না। বললে ওরা মনে করবে পিঙ্কু ভয় পেয়েছে। আজ দাদা বৌদির বিবাহ বার্ষিকী আবার।

সিদ্ধার্থ স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললো তুমি আমার কাছ থেকে অনেকদিন ধরে স্টিলের হাই হিলের অল্প স্ট্র্যাপের জুতো চেয়েছিলে না। কলকাতা থেকে এনেছি।

জুতো জোড়া হাতে নিতেই অনিতার মুখটা পাংশু হয়ে গেল। কল্যাণ বললো, এতো পুরনো জুতো জামাই বাবু। যদিও সুন্দর।

—হ্যাঁ আমি পুরনো জুতোই কিনেছি। কিন্তু নতুনের মতই তো। এই জুতোর নতুন দাম একশ পঁচিশ টাকা। আর আমি কিনেছি মাত্র তিরিশ টাকায়। অনিতা জুতোটা একবার পর দেখি।

অনিতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও জুতোটা পরলো। কিন্তু জুতো পরা মাত্রই এক কাণ্ড হয়ে গেল। কেমন মাথা ঘুরে অনিতা পড়ে গেল। সিদ্ধার্থ তাড়াতাড়ি অনিতাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পা থেকে জুতো খুলে রাখলো। কিছুক্ষণ পরই অনিতার জ্ঞান ফিরে এলো। বললো, হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল।

—কোথা থেকে এ জুতো কিনেছিলে দাদা? পিঙ্কু জিজ্ঞেস করলো।

—রয়েড স্ট্রীট থেকে হেঁটে ওয়েলিংটন মোড়ে আসছিলাম। কবর খানা একটু ছাড়তেই এক বুড়ো মুসলমান ফুটপাথে কিছু পুরনো জুতো বিক্রির জন্য সাজিয়ে বসেছিল। তার কাছ থেকেই কিনেছি। সেদিনটা গেল। পরের দিন সকালে অনিতা একবার জুতোটা পরতেই ফের অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরতেই কিছুক্ষণ জড়ানো গলায় কি যেন বলে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল। পর পর আরও দু'দিন হোল। সিদ্ধার্থ ডাক্তার ডাকলো। ডাক্তার বললেন খুবই দুর্বল। রেস্ট এবং ভাল খাওয়া দরকার। বেশ কিছু ওষুধও দিয়ে গেলেন। বাড়িতে নানা অশান্তিও সৃষ্টি হতে লাগল।

ডাক্তার চলে যাবার পর পিঙ্কু কি যেন ভাবতে লাগলো। পরের দিন সকালে সিদ্ধার্থ অফিস চলে যাবার পর পিঙ্কু চুপি চুপি ঐ জুতো নিয়ে কিছু দূরে একটা চার্চে গেল। চার্চের ফাদারের সঙ্গে দেখা করে সবিস্তারে সব ঘটনা বললো। ফাদার পিঙ্কুর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন ঐ জুতো জোড়া এই চার্চের বাগানে কবর দিয়ে দাও। ফাদার নিজেই একটা ছোট্ট গর্ত খুঁড়ে একটা মন্ত্র উচ্চারণ করে শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা জল ছিটিয়ে আবার মাটি চাপা দিয়ে দিলেন।

—ফাদার এ রকম কেন হোল? পিঙ্কু জিজ্ঞেস করলো।

—এই জুতো জোড়ার মালিক ছিল একটি মেয়ে। বয়েস আন্দাজ করা যায় পঁচিশ থেকে তিরিশ। এটা সে কোন কারণে ভোগ করতে পারেনি। মারা যায়! তার অতৃপ্ত আত্মা এই জুতো জোড়া খুঁজছিল। তুমি না এলে তোমার বৌদিকে বাঁচানো হয়তো সম্ভব হতো না। তুমি খুব সাহসী ছেলে।

পিঙ্কু শান্তিতে বাড়ি চলে এলো। এক দিনের মধ্যেই বৌদি অলৌকিক ভাবে পূর্বের মতো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। সবাই জানলো জুতো জোড়া চুরি হয়ে গেছে। ঝি নিয়েছে। কেননা পিঙ্কু সমস্ত ঘটনাটাই গোপন রেখেছিল। দু'দিন পর পিঙ্কু কলকাতায় চলে এলো।

———

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র, করোলবাগ (নয়াদিল্লী)
এবং বাঙ্গালোর (আর্টিলারি রোড)

ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম ডেভেলপমেণ্ট
কর্পোরেশন লিঃ
(পঃ বঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা ১৩ ফোন ঃ ২৭-২২৫০, ২৭-২২৫১

IPB 1480

মা.র্কটি. ডিভিশন ঃ :এ. অভয় গুহ রোড, কলিকাতা ৬

কি ভাবছেন?

ছেলেমেয়ের লেখাপড়া?
কন্যার বিবাহ?
অথবা
ভবিষ্যতের নিরাপত্তা?
আজই
ফেবারিট
সঞ্চয় প্রকল্পে
যোগ দিন
সেবা
ও
সঞ্চয়ের
একমাত্র
প্রতীক

ফেবারিট

স্মল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

হেড অফিস:
৮৩, পার্ক স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০১৬.
ফোন ২৪-৬৬৫৩, ২৪-৭২৮১
২১-৩৫৮৮

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মসচিব
শ্রী এন, দে